প্রতিশোধমূলক শাস্তি মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গঃ নৈতিক বিবেচনার কয়েকটি দিক

ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Abstract: *Retributive theory of punishment considers the crime as something misdeeds. As we know crime is a break of laws, values and norms of a society or state. If any person intentionally or unintentionally breaks the laws and values of a society would be accused as a criminal. The amount of his/her offense should retreat equally. For example, if any criminal have caused for loosing a leg of other people, the fair justice is to keep his/her one leg. In other terms "eye for an eye", "life for life" and "teeth for teeth" is the central tenets of this theory. Present article have focused this problem from critically point views. As so claim, this article argues that retribution has lot of drawbacks and cannot ensure moral criterion perfectly. Therefore, present study criticizes that the claim of proportionality, equal response to offender is quite impossible in terms of true meaning of punishment.*

ভূমিকা

শাস্তি কী? অভিধানিক অর্থে শাস্তি হলো ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের জন্য কষ্ট দেওয়া। সহজভাবে বলা যায়-নৈতিক অথবা আইনগতভাবে সম্পন্ন কোনো অপরাধের জন্য ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যন্ত্রণা দেয়াই শাস্তি। শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীকে তার যৌক্তিক দাবি থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো কোনধরনের কর্মকাণ্ড বা অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া যাবে? ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যা কিছু ক্ষতিকর, অকল্যাণকর তাই অপরাধ। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিধিবদ্ধ কিছু আইন রয়েছে যা মানতে নাগরিকগণ বাধ্য থাকবেন। কেউ যদি এসব বিধিবদ্ধ আইন লঙ্ঘন করে তাহলেই শাস্তির প্রসঙ্গ চলে আসে। এসব মিলিয়ে বলা যায়-প্রতিষ্ঠিত আইনকে অমান্য করা, কিংবা সমাজ ও মানবতার জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকাণ্ডই অপরাধ। অন্যভাবে বলা যায়-রাষ্ট্র, সমাজ অথবা গোত্রের যেসব বিধি-নিষেধ নাগরিক বা তার সভ্যদের জন্য আরোপ করা হয় তা অমান্য করাই অপরাধ। শাস্তি প্রদানের সঙ্গে তাই আইন, আদর্শ ও অপরাধের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতের অপরাধ প্রতিরোধ করাই শাস্তির অন্যতম লক্ষ্য। অপরাধীদের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এসব অপরাধ দমনের কৌশলেও মাত্রাগত ভিন্নতা রয়েছে। অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে।

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

এসব মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে শাস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছে। এই ভিন্নতার কারণে উপযোগবাদীগণ (utilitarianism) দাবি করেন, শাস্তি মন্দ অপেক্ষা কতোটুকু ভালো ফলোৎপাদন করে তা বিবেচনা করতে হবে। তাঁদের কাছে অপরাধীর কৃতকর্মের ফলাফলের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনেক দার্শনিক মনে করেন, অপরাধের তুল্যবিচারই এর প্রতিকারের উৎকৃষ্ট উপায়। এ মতবাদটি প্রতিশোধমূলক হিসেবে পরিচিত। এ মতাদর্শিগণ অপরাধীর মন্দকাজের (বা অপরাধের) অন্তর্নিহিত দিকটির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে অপরাধকে দেখে থাকেন মনস্তাত্ত্বিক আচরণ হিসেবে, এজন্য তাঁরা সমাধান হিসেবে আচরণের সংশোধনের পক্ষে মত দিয়ে থাকেন। কাজের ফলাফল বিচার, কিংবা কর্মের তুল্যবিচার অথবা অপরাধের অন্তর্নিহিত মূল্য বা সংশোধন? শাস্তির ধরন হিসেবে এরকম বহুমাত্রিক মত ও পথের কারণে বিভিন্ন মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। এসব দার্শনিক মতাদর্শের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো : প্রতিশোধমূলক মতবাদ (retributive theory), প্রতিরোধমূলক মতবাদ (deterrent theory), সংশোধনমূলক মতবাদ (reformative), উপযোগবাদী (utilitarian) ও মানবতাবাদী মতবাদ (humanist)। প্রত্যেকটি মতবাদই কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস চালায়। কিভাবে শাস্তি প্রদান করতে হবে? তুল্যবিচার কি শাস্তির লক্ষ্য? কি কারণে শাস্তি দিতে হবে? যদি ধরে নেওয়া হয় অপরাধের সমতুল্য শাস্তি প্রদানই লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহলে শাস্তির অর্থ দাঁড়াবে প্রতিশোধ নেওয়া। অনেকটা দাঁতের বদলে দাঁত, পায়ের বদলে পা নেওয়ার মতো। অপরাধী যেধরনের অপরাধ করবে তাকে সেই মাত্রার শাস্তি প্রদান করতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্তটিই উক্ত মতবাদটিকে পরিণতিতে প্রতিহিংসাপরায়ণ মতবাদে পর্যবসিত করে হবে। এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে উক্ত প্রবন্ধে শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশোধমূলক মতবাদের বিভিন্ন ধারা ও এর যৌক্তিকতা নিরূপণের প্রয়াস নেওয়া হবে। এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে প্রবন্ধের শুরুতে শাস্তির একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করব। পর্যায়ক্রমে মতবাদটির যৌক্তিকতা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

দুই

শাস্তি ধারণাকে কীভাবে বুঝব?

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত আইন বা আদর্শ যেন নাগরিকগণ অমান্য না করে সেজন্য রাষ্ট্র কতোগুলো পাল্টা ব্যবস্থা রাখে তাই শাস্তি। এই পাল্টা ব্যবস্থাটি কি হতে পারে, কোনসব শর্তের উপর ভিত্তি করে হবে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা লক্ষ করা যায় এণ্ডু ফ্লু, বেনন ও হার্টের গবেষণায়। শাস্তি ধারণাটিকে তাঁরা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে আমরা পাঁচটি উপাদান পাই :

১. শাস্তি অবশ্যই কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা অথবা অন্যকোনো ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত যা অ-আনন্দদায়ক। এই অ-আনন্দদায়ক ঘটনাটি ঘটে থাকে অপরাধীর উপর।

২. আইনের বিরুদ্ধে কাজ করার অপরাধে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

৩. যিনি প্রকৃত দোষী অথবা দোষী হবার অভিযোগে অভিযুক্ত কেবল তাকেই শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৪. শাস্তির বিধান এমন একজন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে যিনি অপরাধী নন। অন্যভাবে বলা যায় যাকে শাস্তি প্রদান করা হবে তাকে অবশ্যই ব্যক্তি মানুষ হতে হবে এবং যিনি শাস্তি বিধানের কর্তৃত্বকারী সংস্থা তাকেও ব্যক্তি মানুষ হওয়া আবশ্যক।

৫. শাস্তি অবশ্যই কোনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই আইন দ্বারা সিদ্ধ হতে হবে।

শাস্তি সম্পর্কে উপর্যুক্ত পাঁচটি উপাদানকে একত্রিত করে বলা যায়—প্রতিষ্ঠিত কোনো আইন অমান্য করার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনীয় ব্যবস্থাই হলো শাস্তি। শাস্তি হতে হবে নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার অধীনে। শাস্তি সম্পর্কে ফ্লু যা দাবি করেন তাকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি : স্বনিহিত অর্থে শাস্তি হলো অকল্যাণ বা অ-আনন্দদায়ক বিষয়। যিনি অপরাধী কেবল তাকেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। অপরাধীই কেবল এই অকল্যাণ বা অস্বচ্ছন্দ অবস্থাটি ভোগ করবেন। অনেকসময় লক্ষ করা যায় ব্যক্তি অপরাধী হলেও শাস্তি পাচ্ছেন, আবার অপরাধ না করলেও তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়ার কারণে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থাটির সঙ্গে সামাজিক আধিপত্য ও প্রতিহিংসা জড়িত। এই অবস্থাটি কারো প্রতি প্রতিহিংসাবশত মনগড়া অপরাধের অভিযোগ দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দৈনিক পত্রিকার পাতায়ও এধরনের শাস্তির দৃষ্টান্ত খোঁজে পাওয়া যায়—"বিনা দোষে পাঁচ বছর কারাবাস"। শাস্তি প্রদানের এটি উৎকৃষ্ট কোনো উপায় নয়। কারণ শাস্তি মনগড়া কিংবা স্বেচ্ছাচারী বিষয় নয়। কেউ যদি অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় তবেই কেবল তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এখন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতার্থে অপরাধী হতে পারে, অথবা ঘটনাচক্রেও অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারেন। কেবল নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার পক্ষেই সম্ভব যথাযথ বিষয়টি বের করে নিয়ে আসা। বিচার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি যদি অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় তাহলেই কেবল শাস্তির শর্তটি ঐ ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে অপরাধ, অপরাধী ও শাস্তি যৌক্তিক সম্পর্কে সম্পর্কিত।

শাস্তির সঙ্গে অপরাধীর কর্মফল জড়িত। এই ফলাফল নানাভাবে ব্যক্তির উপর আরোপ করা যায়। অপরাধবিজ্ঞানে শাস্তি ধারণাটিকে নানা ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। শাস্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবার প্রয়োজনে আমরা এর দুটি ধরন নিয়ে আলোচনা করতে পারি: ক. ইতিবাচক শাস্তি (positive punishment), খ. নেতিবাচক শাস্তি

1 Flew, A., 1954, "The Justification of Punishment", *Philosophy*, Vol. 29, p.29.
2 Benn, S. I.1958. 'An Approach to the Problems of Punishment', *Philosophy*, Vol. XXXIII.
3 Hart, H. L. A. 1959-60. 'Prolegomenon to the Principles of *Punishment*', Proceedings of the Aristotelian Society, N.S. Vol. LX .
4 Flew, A., 1954.

(negative punishment)। তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষভাবে কোনো উদ্দীপকের উপস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা, কিংবা ব্যক্তির আচরণের মাত্রা বোঝে সে মোতাবেক উদ্দীপকের উপস্থিতি বৃদ্ধি করা ইতিবাচক শাস্তির প্রকৃতি। এধরনের শাস্তির দাবি হলো– প্রতিক্রিয়ার জন্য অ-আনন্দদায়ক উদ্দীপক বৃদ্ধি করা। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। কাউকে যদি আঘাত করা হয়, বৈদ্যুতিক শক প্রদান করা হয়, কিংবা অন্যকোনোভাবে শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধি করা হয় তাহলে এর ফল হিসেবে ঐ ব্যক্তির আচরণের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হবে। এই পরিবর্তন হলো ব্যক্তির সংশোধিত হবার সুযোগ। ইতিবাচক শাস্তির ফলাফল ব্যক্তির জন্য খুবই ভয়ানক। এধরনের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ফলাফল চাওয়া হয়। ব্যক্তির শুভ বা সংশোধিত কোনো আচরণকে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয় না। আবার নেতিবাচক শাস্তি ঠিক তার উল্টোটা। সুখদায়ক উদ্দীপকের উপস্থিতি কমিয়ে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করাই নেতিবাচক শাস্তি। যেমন, অফিসের কোনো কর্মকর্তা যদি কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়েন, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য নেতিবাচক শাস্তি হবে তার পেশাগত সুযোগ-সুবিধাদি কমিয়ে আনা। হতে পারে বেতন থেকে অর্থ কর্তন করা, কিংবা প্রমোশন দেরিতে প্রদান করা। এভাবে তার সুযোগ কমে আসার কারণে একসময় হয়তো তার আচরণে শুদ্ধতা আসবে। আবার সে কর্মতৎপর ও নিয়মনিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। নেতিবাচক শাস্তির সঙ্গে দুটি বিষয় জড়িত : প্রথমত, অপরাধীকে তার নিয়মতান্ত্রিক কাজকর্ম থেকে বিরতি দেওয়া, দ্বিতীয়ত, অপরাধীকে তার অপরাধের তুল্যমূল্য প্রদান করা।

ব্যক্তি যদি অন্য কারো প্রতি আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করে তাহলে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা, আইনীয় ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়। ব্যক্তি যদি এমনকিছু আচরণ করে যা ব্যক্তির নিজের বা অন্যের জন্য তাৎক্ষণিক নেতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসে তাহলে তা দমন করা হয়। এই দমনটাই শাস্তির নামান্তর। যেমন, কোনো পথচারি যদি হাইওয়ে রোডে দৌঁড়-ঝাপ করে তাহলে সে দুর্ঘটনার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। এর ফলে রাস্তায় যানজট থেকে শুরু করে অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে। ঐ ব্যক্তির জীবননাশ হতে পারে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই সেখান থেকে শক্তি প্রয়োগ করে সরিয়ে আনতে হবে। শাস্তি দেয়া হবে এ কারণে যে, ভবিষ্যতে সে যেন এরকম কাজ না করে। এখানে ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার ক্ষতিকর আচরণের জন্য। এবিবেচনায় ক্ষতিকর আচরণও শাস্তির কারণ হতে পারে।

ক্ষতিকর আচরণ, স্বভাবজাত আচরণ কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কারো ক্ষতি এসবই নেতিবাচক কর্মকাণ্ড। নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখার জন্যই শাস্তির বিধান রাখতে হয়। প্রশ্ন হতে পারে সকলসময় আমরা কি শাস্তির বিধান রাখি? শাস্তি প্রদানের জন্য কি কোনো ব্যতিক্রম নেই। দুটি উদাহরণের সাহায্যে এর উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি : ধরা যাক কোনো একজন ব্যক্তি মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এই অবস্থায় তার অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলে

এমন কেউ নেই যিনি তাকে হাসপাতালে প্রেরণ করবেন। আহসান সাহেব অসম্ভব মানব দরদী ব্যক্তি। দুর্ঘটনাস্থলের জটলা দেখে আহসান সাহেব সেখানে উপস্থিত হন। জরুরিভিত্তিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তিনি হাসপাতালে প্রেরণ করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ তার অতি-রক্তপাত বন্ধ করতে সমর্থ হন। ফলে লোকটি বেঁচে যান। উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তিটি পেশায় একজন পুলিশ। কোনো সময় আহসান সাহেবকে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলায় পুলিশ হেফাজতে যেতে বাধ্য করেন। আহসান সাহেব ঐ পুলিশ কর্মকর্তার কাছে ন্যায়সঙ্গত সাহায্য প্রত্যাশা করলেও তিনি তা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে আহসান সাহেব যদি ঐ পুলিশকে হাসপাতালে স্থানান্তর না করেন তাহলে কি আহসান সাহেবকে শাস্তি ভোগ করতে হবে? আইনীয় বা বৈচারিক প্রক্রিয়ায় হয়তো তা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকেই হয়তো আহসান সাহেবের একাজটিকে নিন্দা করতে পারেন। বলতে পারেন যে, তিনি যথাযথ কাজটি করেননি। আত্মসচেতন মানুষের জন্য এটাই শাস্তি। অন্যদিকে আহসান সাহেব তাকে যে হাসাপাতালে নিয়ে সারিয়ে তোলেছেন তা দেখে ঐ পুলিশ কর্মকর্তা অনুতপ্ত হবেন। ভবিষ্যতের তিনি যেন এরকম কোনো অনুতাপের শিকার না হন সে মোতাবেক আচরণ করবেন। এই অনুতাপও একধরনের শাস্তি।

শাস্তির উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধরন থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি প্রকৃতিগত দিক থেকে শাস্তির মাত্রা, বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বাস্তবতায় বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। অনেক আইনপ্রণেতা শাস্তি ধারণাটিকে এর অন্তর্নিহিত চরিত্রের দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। এ মোতাবেক শাস্তি দু'ধরনের : ক. অন্তর্নিহিত শাস্তি (intrinsic punishment) ও খ. বাহ্যিক শাস্তি (extrinsic punishment)। ব্যক্তির স্বভাবের কারণে যে শাস্তি পেয়ে থাকে তা হলো অন্তর্নিহিত শাস্তি। যেমন, কেউ যদি অসাবধানতার সঙ্গে দাঁড়ালো ছুড়ি ব্যবহার করে তাহলে তার হাত কেটে যাবে। কারো যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে তাহলে তার কাশি হবে, শ্বাস-কষ্ট হবে। এসবই হলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আচরণের ফলে সংঘটিত প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াসমূহ একধরনের শাস্তি যা ব্যক্তিকে শেখায় কোন্ কাজ তার করা উচিত, কোন্ কাজ থেকে তার বিরত থাকা উচিত। এধরনের শাস্তি অবশ্যই ব্যক্তির আচরণের অনুষঙ্গ ধরেই হয়। তবে তা স্বভাবজাত বা প্রকৃতিজাত নয়। যেমন, কোনো শিশু যদি তার দাদিকে গালমন্দ করে, কিংবা দাদিকে আঘাত করে তাহলে দাদি হয়তো শিশুর হাত থেকে খাবার কেড়ে নিবেন। এটা হলো শিশুর কৃত-আচরণের প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই হলো বাহ্যিক শাস্তি। এই শাস্তির ফলে হয়তো শিশু ভবিষ্যতে তার দাদির সঙ্গে এরকম আচরণ নাও করতে পারে।

শাস্তির যৌক্তিকতা কয়েকটি দিকের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি অপরাধ না করে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া অবিচারের সামিল। আর কাউকে শাস্তি দেবার অর্থ হলো অপরাধী ও ভবিষ্যত অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা। যদি অপরাধ নিবৃত্ত করা না হয় তাহলে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে সমাজ তার প্রকৃত সংহতি হারিয়ে ফেলবে। অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার দায়ে সমাজে বসবাস অনুপযোগী হয়ে উঠবে।

সমাজকে বসবাস উপযোগী করে তোলার জন্যই অপরাধ নির্মূল করা জরুরি। প্রশ্ন হতে পারে কীভাবে তা সম্ভব? এ প্রশ্নের বহুমুখী উত্তর থাকতে পারে। কেউ মনে করতে পারেন অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে তা করা উচিত। আবার কেউবা মনে করতে পারেন অপরাধীর মানসিকতা ও আচরণ সংশোধন করে তাকে সমাজের মূলধারায় ফিরে আনার মাধ্যমে অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব। যেভাবে বা যেমাত্রায়ই হোক না কেন কেবল শাস্তিই পারে অপরাধীকে দমিয়ে রাখতে। উপরের সবকয়টিই শাস্তির ধরন। শাস্তির ধরনটি মূলত অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু যিনি শাস্তি দিবেন তার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব রয়েছে কি-না, তিনি নিরপেক্ষ কি-না এসবই শাস্তির বৈচারিক প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত। এজন্য শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হলো যিনি শাস্তি দিবেন তাকে অনিবার্যভাবে বিচারজ্ঞানসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে।

শাস্তি প্রদানের সঙ্গে বহুবিধ বাস্তবতা ও শর্ত জড়িত। এরমধ্যে একটি শর্ত হলো শাস্তিবিধানকারী কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব। অবশ্যই এ কর্তৃপক্ষকে হতে হবে রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত কোনো প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানই নির্ধারণ করবে ব্যক্তির অপরাধের মাত্রা কিরকম হবে, সেই অপরাধের জন্য তার শাস্তির ধরনই-বা কীরকম হবে। ধরা যাক, কোনো একজন অপরাধী একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এখন সেই অপরাধীর বিচার কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালখুশী অনুসারে সম্পন্ন হলে হবে না। অপরাধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত সংস্থা দ্বারা এ বিচার কাজ সম্পন্ন হতে হবে। উপর্যুক্ত শর্তাদিসমূহের আলোকে বলা যায়-কোনো অপরাধ তা যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সনাক্ত করা হয়, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনীয় ব্যবস্থায় এনে অ-আনন্দাদায়ক কিছু করাই শাস্তি। ফ্লু মনে করেন, শাস্তির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। যাকেই শাস্তি দেওয়া হোক তা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে। যদি কোনো পদ্ধতি বা আইন অনুসরণ না করে কাউকে শাস্তি প্রদান করা হয় তাহলে সেই বিচার প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির খেয়াল-খুশির উপর ভিত্তি করে হয়েছে বলে গণ্য হবে।

শাস্তি যেন ব্যক্তির খেয়ালখুশির উপর না হয় সেজন্য ফ্লু' উপর্যুক্ত শর্তাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শাস্তি প্রদানের জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি শাস্তির মাত্রাও নির্ধারণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে শাস্তির মাত্রা কীভাবে নির্ধারিত হবে? শাস্তি পরিমাপের জন্য কি কোনো প্যারামিটার রয়েছে অথবা শাস্তির সর্বোচ্চ মাত্রা কী হতে পারে? উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের গেষ্টাপো বাহিনী নির্মমভাবে হাজার হাজার জিউসদের হত্যা করেছে। এ হত্যার বিচারে হিটলারকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে। এটাতো একজন হিটলারকে শাস্তি দেয়া হলো। কিন্তু তার নির্দেশে যে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেই হাজার হাজার মৃত্যু কি এক হিটলারের উপর বাস্তবায়ন করা সম্ভব? মোটেই না। এক হিটলারের উপর হাজার মৃত্যুদণ্ড দেয়া অবাস্তব। শাস্তির মাত্রা বোঝানোর জন্য অন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একজন অপরাধী কাউকে হত্যা করেছে। হত্যার সময় কত মাত্রায় সে ব্যক্তিকে

কষ্ট দিয়েছে, কিভাবে হত্যা করেছে এসব শর্ত অপরাধীর বিচারের সময় হুবহু আরোপ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই শাস্তি হবে আনুমানিক কিংবা প্রায়।

উপর্যুক্ত দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায় অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য দাঁড়িপাল্লার পরিমাপকাঠি ব্যবহার সম্ভব নয়। অবস্থা, পরিস্থিতি বোঝে গড়পরতা সিদ্ধান্তের উপর শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। তাহলে শাস্তির মাত্রাগত তারতম্যকে আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব? এ প্রশ্নটি আমরা বুঝতে পারি শাস্তির চারটি ধারা বোঝার মাধ্যমে : ক. অপরাধীর প্রতি কঠোর হওয়ার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতোটা কঠোর যে, প্রয়োজনে তাকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে হতে পারে, খ. অপরাধীর শাস্তির মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন মেয়াদে কয়েদ বাস দেয়া যেতে পারে, গ. অর্থদণ্ডও শাস্তির একটি মাত্রা হতে পারে, ঘ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বিরোধী অবস্থান নিয়েছে তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। শাস্তির উপর্যুক্ত মাত্রাসমূহ পৃথিবীর নানাদেশে এখনও প্রচলিত রয়েছে। শাস্তি হিসেবে কোথাও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে, কোথাওবা অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। প্রশ্ন হলো এসবের মধ্যে কোনটি যথাযথ? শাস্তি সম্পর্কিত আলোচনায় এপ্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত।

যেভাবেই আমরা শাস্তিকে নির্ধারণ করি না কেন নাগরিককে শাস্তি দিতে হবে সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য। অপরাধের সঙ্গে শাস্তির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্বীকার করে নিতে হবে। এজন্য অপরাধ যথাযথভাবে সনাক্ত করা খুবই জরুরি। ব্যক্তি তার কৃত-অপরাধের জন্য যে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তা যথাযথভাবে বিচার করার জন্য নৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। তবে দার্শনিকদের অনেকেই মনে করেন, শাস্তি অবশ্যই যৌক্তিকভাবে বিচার্য হতে হবে। রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে এই যৌক্তিকতায় তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে এরকম কোনো তারতম্য থাকা যাবে না। বিষয়টি হলো: দুজন ব্যক্তির একজন কৃষ্ণাঙ্গ, অন্যজন শ্বেতাঙ্গ। একই অপরাধের দায়ে শ্বেতাঙ্গ ক্ষমা পেয়ে যাবে, আর কৃষ্ণাঙ্গ শাস্তি পাবে তা আপত্তিকর। বিচারের নামে তাকে অবিচারও বলা যায়। ধনী ও গরীব, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এরকম কোনো বিষয়ই বিচারে প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাহলে তা হয়ে যাবে বিচারের নামে অবিচার।

শাস্তির স্বরূপ সম্পর্কে জানা হলেও আমাদের জানা প্রয়োজন : শাস্তির লক্ষ্য কী? উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলতে পারি : শাস্তির মূল লক্ষ্য কিন্তু প্রতিশোধ নয়। শাস্তি হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। আইন অমান্যকারীকে আইনের সম্মুখীন করাই শাস্তির লক্ষ্য। এমতের পক্ষে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে :

এক. অপরাধীকে শাস্তিদানের অন্যতম একটি লক্ষ হলো—বর্তমান ও ভবিষ্যত অন্যায়কারীর জন্য হুশিয়ারি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এই দৃষ্টান্ত সামাজিক সংহতি ও আইনের শাসন বলবৎ রাখার সহযোগী শক্তি হিসেবেও কাজ করে থাকে। যেমন, কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করার অর্থ হলো অন্যান্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে একধরনের সতর্কতা বা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা। অনেকটা ফুটবল খেলায় লাল বা হলুদ কার্ড দেখানোর মতো।

প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে গোল করতে বাধা সৃষ্টিকারীকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করা হয় সে যেন ভবিষ্যতে এরকম বাধার সৃষ্টি না করে। দু'বার হলুদ কার্ড প্রাপ্তির পর লালকার্ড দেখিয়ে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বহিষ্কার করা হয়। খেলোয়াড়কে কার্ড দেখানোর অর্থ হলো সে যেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ধাক্কা না দেয়, কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খেলার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত না করে। একইভাবে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পরিসরে আইনীয় প্রক্রিয়ায় শাস্তি অবলম্বন করার অর্থ হলো অপরাধীকে সতর্ক করে দেওয়া। শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরাধীকে ভবিষ্যত অপরাধ থেকে বিরত রাখাই এর লক্ষ্য।

দুই. শাস্তির পক্ষে জোরালো দাবি হলো—অপরাধ রোধ করা, এর পুনরাবৃত্তিকে প্রতিহত করা। কোনো অপরাধীকে যদি ন্যায্য বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় পুনরায় একইধরনের অপরাধ সংঘটিত করা। যেমন, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবৎজীবন জেল প্রদান করার লক্ষ্যই হলো উক্ত অপরাধীকে পুনরায় জঘন্যতম অপরাধ থেকে বিরত রাখা। অপরাধীদের নিবৃত্ত করার অর্থ হলো প্রাথমিকভাবে অপরাধীকে অক্ষম করে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থা করা।

তিন. শাস্তি প্রদানের আরেকটি লক্ষ্য হলো—অপরাধীর আচরণ ও মনোভাবে সংস্কার সাধন করা। শাস্তি অনেকসময় আচরণের পুনর্মূল্যায়ন করতেও সাহায্য করে। কোনো অপরাধী যখন অপরাধ সংঘটন করে তাতে তার বিশেষ মনোভাব বা প্রবণতার ছাপ থাকে। অপরাধী যে মনোভাব থেকে অপরাধটি সংঘটিত করেছে তা যে সঠিক নয়, তা যে অন্যের জন্য ক্ষতিকর, সামাজিক অগ্রগতি ও সংহতির জন্য বাধাস্বরূপ তা বুঝিয়ে দেওয়াই শাস্তির লক্ষ্য।

চার. শাস্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—অপরাধ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতির ফলে যেসব গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনা। এই মানসিক প্রশান্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তথা সমাজে জেগে ওঠা প্রতিশোধ স্পৃহাকেও নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে। অপরাধের শাস্তি না থাকলে অপরাধীর অপরাধ যাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগাতে পারে। এই প্রতিশোধ স্পৃহার ফলে আরো নতুন নতুন অপরাধের ধারা চলতে থাকবে। তা যেন অব্যাহতভাবে না হয় সেজন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তি দানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সৃষ্ট ক্ষোভ প্রশমিত করা উচিত। ফলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়।

ছয়. শাস্তি প্রদান অবশ্যই বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হতে হবে। এই প্রক্রিয়া এমন যে, তাতে পক্ষ-বিপক্ষের পর্যালোচনা থাকতে হবে। পর্যালোচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তির আওতায় আনার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিচার প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নৈতিক পর্যালোচনার জন্য নীতিবিশ্লেষকদের কাছেও পাঠানো যেতে পারে। রায়ের সিদ্ধান্ত জনগণের মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ কি-না তা যাচাই-বাছাই

করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্রদত্ত রায়ের পক্ষে কোনো নৈতিক সমর্থন না থাকলে সে সিদ্ধান্ত পাবলিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সাত. অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত। কারণ অপরাধের জন্য শাস্তি আছে তা জানলে অন্যরা অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। হতে পারে ঐ ব্যক্তির মাঝে নীতিজ্ঞান নেই, অপরাধ করার প্রবণতা আছে। কিন্তু শাস্তির বিধান চালু থাকার ফলে ঐ ব্যক্তি শাস্তির ভয়ে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যগুলোর আলোকে বলা যায়—শাস্তির পক্ষে অনেক জোরালো দাবি আছে। কিন্তু, শাস্তি কি অপরাধ কমিয়ে আনার একমাত্র কৌশল? আমরা লক্ষ করে দেখব শান্তিবাদ, অধিকারবাদ তথা সমতাবাদীগণ শাস্তিকে প্রতিহিংসার মাধ্যম হিসেবে দেখে থাকেন। আসলে সামাজিক জীবনে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধই পারে সামাজিক সকল অবিচার ও অপরাধ থেকে মুক্ত করতে। এবিবেচনায় শাস্তির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উথাপন করে থাকে। তবে শাস্তির পক্ষে বা বিপক্ষে তাৎক্ষণিক অবস্থান নেয়া খুবই জটিল বিষয়। এজন্য আমরা আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে পারি। এবিবেচনার অংশ হিসেবে বর্তমান প্রবন্ধে শাস্তির প্রতিশোধমূলক মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

তিন

শাস্তি হিসেবে প্রতিশোধ

প্রতিশোধমূলক মতাদর্শিদের মূলকথা হলো—অপরাধের জন্য শাস্তি হলো তার সমতুল্য শোধবোধ। সমতুল্য শোধবোধ দ্বারা বোঝাচ্ছে যে, অপরাধী যেমাত্রায় অপরাধ করবে তাকে সেই মাত্রায় শাস্তি প্রদান করতে হবে। প্রকাশ্যে বা অগোচরে যেভাবেই কারো ক্ষতিসাধন করা হোক না কেন তাকে সেই পরিমাণ শাস্তি প্রদান করাই ন্যায় হবে। প্রাচীন গ্রিকদর্শনে শাস্তি সম্পর্কে এ ন্যায্যতার উপর গুরুত্বারোপ করা হতো। সোফিস্ট দার্শনিকদের অনেকেই মনে করতেন "চোখের বদলে চোখ" এবং "দাঁতের বদলে দাঁত"। অন্যভাবে বলা যায়—অপরাধীর কৃত-অপরাধের শোধবোধ বিবেচনা করতে হবে গাণিতিক হিসেবে। একজন ব্যক্তি যদি 'ক-মাত্রার অন্যায় করে তাহলে ঐ ব্যক্তির ঠিক ক-মাত্রায় শাস্তি দেওয়াই ন্যায়। শাস্তির ন্যায়বিচারের এই গাণিতিক হিসেবটি গ্রিক অভিধার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

শাস্তি সম্পর্কিত এধারাটির বিকাশ ঘটেছে lax talionis ধারণা থেকে। এধারণাটি বোঝায় কোনো অপরাধীর অপরাধ কর্মের জন্য ব্যক্তি যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে ঐ অপরাধীও যেন তা ভোগ করে। অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে একটি ভারসাম্যাবস্থা কিংবা সমানুপাতিক বাস্তবতা সৃষ্টি করাই এ মতবাদের লক্ষ্য। শাস্তি প্রদানের জন্য প্রতিশোধ ধারণাকে যদি lax talionis এর দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করার কিছু সমস্যা রয়েছে। একজন ধর্ষকের বিচার কীভাবে হবে? নিশ্চয়ই এ মতবাদ বলবে পাল্টা তাকেও ধর্ষণ করাতে হবে। কিংবা একজন

অপরাধী কোনো ভিক্টিমকে যেভাবে শাস্তি দিয়েছে ঠিক একই ধারায়, একই মাত্রায় কি ঐ অপরাধীকে শাস্তি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব? নিশ্চয়ই না। lax talionis ধারণার আলোকে শাস্তি প্রদানের বিধানে আরো বহুবিধ জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। এই জটিলতার কারণে শাস্তির প্রতিশোধ মতবাদকে পরিপূর্ণ প্রতিশোধ বা শোধবোধ হিসেবে বোঝার কিছু সমস্যা রয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে এ মতবাদকে আমরা কীভাবে বুঝব? এরকম বোঝাপড়ার পাশাপাশি এ মতবাদের আরেকটি সংকট হলো শাস্তিকে প্রতিহিংসার দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা। এজন্য অনেকসময় প্রতিশোধমূলক মতবাদকে প্রতিহিংসাপরায়ণ মতবাদ (vengeance theory) হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কারো প্রতি হিংসাবশত বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে শাস্তি দেবার কথা বলে এ মতবাদ। মতবাদটির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব অনুধাবন করেই শাস্তির প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিশোধের প্রস্তাব করা হয়। প্রতিহিংসার সঙ্গে প্রতিশোধের পার্থক্য রয়েছে। প্রতিহিংসা স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ থাকে। অনেকসময় বিচারক ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন। তাই বলে প্রকৃত অপরাধ থেকে অপরাধীকে ছাড় দেওয়া যাবে না। অপরাধীর তুল্যবিচারও প্রদান করতে হবে। এই তুল্যবিচার প্রতিহিংসা নয়, বরং প্রতিশোধের নামান্তর। এজন্য শাস্তি হিসেবে এ মতবাদকে প্রতিহিংসামূলক না বলে প্রতিশোধমূলক হিসেবে উল্লেখ করছি।

প্রতিশোধমূলক মতবাদ কাজের ফল অনুসারে শাস্তির প্রস্তাব করে থাকে। এ মতবাদের দাবি হলো : যেকোনো অপরাধের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়া (intrinsically the appropriate response) হলো শাস্তি। তবে এ প্রতিক্রিয়া হতে হবে যথোপযুক্ত। কেভাডিনো ও ডিগনান উভয়ই এরকমই দাবি করছেন। তাঁরা মনে করেন, যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে কেবল তার উপরই গুরুত্বারোপ করতে হবে। শাস্তি ভবিষ্যতে কি ফলাফল বয়ে আনবে তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিশোধমূলক মতবাদও দাবি করে যিনি অপরাধী তিনি অবশ্যই শাস্তি পাবার যোগ্য। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মাইকেল কাহিলও এরকমটি দাবি করেন। শুধু অপরাধীই শাস্তি পাবার যোগ্য। এখানে দুটি অপরিহার্য শর্ত মেনে চলতে হয় : ক. অপরাধকে যথাযথভাবে সনাক্ত করতে হবে ও খ. সনাক্তকৃত অপরাধের শাস্তিটি যথাযোগ্যভাবেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে যথাযোগ্যতার অর্থই হলো তুল্যশাস্তি।

শাস্তি কেন প্রতিশোধমূলক হওয়া উচিত ?

শাস্তি কেন প্রতিশোধমূলক হবে? এরকম প্রশ্নের জবাবে প্রতিশোধমূলক মতাদর্শীগণ সামাজিক অগ্রগতি ও সংহতির দোহাই দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, কৃতকর্মের জন্য ব্যক্তি শাস্তি পাবেন এটা সামাজিক অগ্রগতি ও সংহতির জন্যই প্রয়োজন। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, কিংবা নিজের স্বার্থকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মানসিকতা থেকে অন্যের ক্ষতি করতে পারেন। এই ক্ষতি যেন পুনরাবৃত্তি না হয় তা লক্ষ্য রেখেই অপরাধীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হয়। প্রত্যেক সমাজেই কতোগুলো সংবিধিবদ্ধ

নিয়ম থাকে। এই নিয়মসমূহের লক্ষ্য হলো সামাজিক জীবনকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা। পরস্পরকে আস্থাবান করে তোলা। কেউ যদি সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে বিচারের আওতায় এনে তুল্যদণ্ড প্রদান করতে হয়। কারণ অপরাধী যে মানসিকতা থেকে অপরাধ করছে তা সামাজিক জীবন তথা সামষ্টিক স্বার্থের পরিপন্থি হতে পারে। এজন্য সামাজিক সংহতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির কৃতকর্ম যা সামাজিক আইন-কানুনের পরিপন্থি তা প্রতিরোধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রতিরোধের প্রয়োজনেই শাস্তি গুরুত্বপূর্ণ। এ মতাদর্শিগণ অপরাধের তুল্য শাস্তি বিধানের পক্ষপাতি বলেই একে প্রতিশোধমূলক শাস্তি মতবাদ বলা হয়। তুল্যবিচারের মাত্রাগত তারতম্য থাকে। এই মাত্রার উপর ভিত্তি করে দার্শনিকদের কেউ কঠোর হবার কথা বলেন, কেউবা নরম হবার কথা বলেন। কঠোর ও নরমের উপর ভিত্তি করে প্রতিশোধমূলক মতবাদকে দু'ভাগে বিবেচনা করা যেতে পারে : ক. কঠোর প্রতিশোধমূলক মতবাদ (rigoristic retributive theory) ও খ. লঘু প্রতিশোধমূলক মতবাদ (modified retributive theory)।

কঠোর প্রতিশোধমূলক মতবাদ. কঠোর মতবাদ অনুসারে মনে করা হয়–অপরাধের মাত্রা, বৈশিষ্ট্য ও ধরন অনুসারে শাস্তি দিতে হবে। ধরা যাক, কোনো একটি অপরাধ 'ক-মাত্রার ও 'খ-বৈশিষ্ট্যের তাহলে অপরাধীকে এই 'ক-মাত্রার 'খ-বৈশিষ্ট্যের শাস্তিই দিতে হবে। যেকোনো বাস্তবতায় শাস্তির বিধানে কোনো তারতম্য হলে হবে না। অপরাধী সামাজিকভাবে কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হতে পারেন, কিংবা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। কঠোর মতাদর্শিগণ মনে করেন এসব বাস্তবতা শাস্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকী পরিস্থিতিগত কোনো শর্তও শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে না। নিচের উদাহরণের সাহায্যে মাত্রাগত শর্তটি বোঝা যেতে পারে :

ক. একজন ঠিকাদার তার ঠিকাদারি ব্যবসায় অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য সেতু নির্মাণে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করেছে। উক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা খুবই সৎ। ঠিকাদার নানা অবৈধ উপায়ে তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তদন্ত কর্মকর্তাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে না পেরে তাকে হত্যা করা হয়। উক্ত হত্যাকাণ্ডের বিচারে কিধরনের শাস্তি ন্যায্য হতে পারে?

খ. কোনো একজন ব্যক্তি ডাকাতের হাত থেকে নিজের জীবন রক্ষার স্বার্থে গড়ে তোলা প্রতিরোধে আক্রমণকারীর মৃত্যু হয়েছে। এক্ষেত্রে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি কী প্রতিক্রিয়া জানাবে?

---

৫ মিল রেখে তাই প্রতিদান শব্দের পরিবর্তে 'প্রতিশোধ' পরিভাষাটি ব্যবহার করছি। এখানে প্রতিশোধ ধারণাটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ? যে যতোটুকু অন্যায় করবে সেই অনুপাতে তার শাস্তির বিধান রাখতে হবে। কিন্তু শাস্তির বিধানটি প্রতিদানের সঙ্গে যায় না। প্রতিশোধমূলক মতাদর্শিদের বক্তব্যের মূলকথা হলো "মৃত্যুর বদলে মৃত্যু"। এটি প্রতিশোধের সমপর্যায়ের। মতবাদটির এ গতির কারণে, এর অন্তর্নিহিত দিকসমূহ বিবেচনা করে একে আমরা প্রতিদানমূলক না বলে 'প্রতিশোধমূলক" মতবাদ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি।

6 Cavadino, Michael and Dignan, James, 2007. The Penal System: An Introduction, 4th edn Sage Publications Limited, 44.

7 Cahill. Michael, 2007. Retributive Justice in the Real World, Washington University Law Review, 85, pp. 815-818.

উপর্যুক্ত দুটি দৃষ্টান্তের প্রথমটি ও দ্বিতীয়টির মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কঠোর মতাদর্শিগণ এ মাত্রা অপেক্ষা হত্যাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তার তুল্যবিচার করার পরামর্শ দিবেন। তাঁদের বিবেচনা হলো অপরাধ অপরাধই, এর কোনো পরিস্থিতি ভেদ নেই। শাস্তির এ ধারাটি অনেকটা বদলা নেবার মতোই। যেমন, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, জীবনের বদলে জীবন। উপর্যুক্ত দুটি অবস্থা (ক) ও (খ) এর মধ্যে কোনো তারতম্য না করেই এ মতবাদ তুল্যশাস্তির প্রস্তাব করবে। মতবাদটিরর এরকম অবস্থানের কারণে একে কঠোর প্রতিশোধমূলক মতবাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

লঘু প্রতিশোধমূলক মতবাদ. প্রতিশোধমূলক মতবাদের এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত উদারবাদী। উপরিল্লিখিত দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রথমটির ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধের পক্ষপাতি হলেও দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে তারা লঘু শাস্তিবিধানের পক্ষে অবস্থান নিবেন। এপ্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হলো শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকসময়ই অপরাধের মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে শাস্তি দেওয়া যায় না। অপরাধীর বয়স, বিশেষ পরিস্থিতি, অপরাধীর শারীরিক ও মানসিক বাস্তবতাও গুরুত্ব দিতে হয়। এ বিবেচনায় অনেক অপরাধীর শাস্তি কঠোর প্রতিশোধমূলক অর্থে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অপরাধকে একটি মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা হিসেবে ধরে বিষয়টির স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তির কিশোর বয়স থেকে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে। ঐ কিশোরকে যদি থামিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে সে বিপদগামী কিশোরদের সঙ্গে মেলামেশা করে আরো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এরকম বাস্তবতায় ঐ কিশোরকে যদি ভালো পরিবেশে রাখা যায়, কিংবা আদর স্নেহ দিয়ে তার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলা যায় তাহলে হয়তো তার মধ্য থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করা সম্ভব। সুস্থ পরিবেশের প্রভাবে যেখানে একজন অপরাধীর ভালো হয়ে যাবার কথা, কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশে সে আরো বেশি ভয়ংকর অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশ বাস্তবতায় কোনো ব্যক্তি অপরাধী হতে বাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে সেই অপরাধীর শাস্তির বিষয়টি কীভাবে বিবেচনা করা হবে? এবিবেচনা লঘু বিধানটির পক্ষে অনেকে অবস্থান নেন।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটি বিচারের জন্য আমরা লঘু প্রতিশোধমূলক মতাদর্শিদের অবস্থান লক্ষ করতে পারি। তাঁদের দাবি হলো-অপরাধের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে শাস্তি লঘু হতে পারে। প্রতিশোধমূলক মতানুসারে, একজন হত্যাকারীর সমতুল্য শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু, ঐ অপরাধীর উপার্জনের উপর পরিবারের ছোট ছোট শিশু, বয়োবৃদ্ধ বাবা-মা এবং চাকুরবিহীন স্ত্রীর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে পরিবারের এই নির্ভরশীল মানুষদেরও অর্থকষ্টে পড়তে হবে। এতে করে একটি হত্যাকাণ্ড আরো অসংখ্য নিপীড়ণ কিংবা কষ্টকে সামনে নিয়ে আসতে পারে। এরকম বিশেষ পরিস্থিতিতে শাস্তির বিধান কি লঘু করা যেতে পারে? প্রতিশোধমূলক মতাদর্শিদের অনেকেই বিশেষ পরিস্থিতিতে লঘু শাস্তির প্রস্তাব করেন। সকলসময় কঠোর মনোভাব সমাজ জীবনে সংহতি কিংবা শান্তি নাও ফিরিয়ে আনতে পারে। কঠোর ও লঘু প্রতিশোধের যেকোনো ধারার সঙ্গে বিশেষ কতোগুলো শর্ত জড়িত থাকে। এই শর্তের মধ্য

দিয়ে বোঝা যায় মতবাদটির মাত্রা ও স্বরূপ কিরকম হতে পারে। শর্তসমূহ বোঝা যেতে পারে :

ক. ক্ষতিপূরণ মানদণ্ড (compensation standard). কোনো ব্যক্তি যে মাত্রায় অন্যায় করবে ঠিক সেইমাত্রায় তাকে শাস্তি দিতে হবে। এখানে ক্ষতি হলো দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি। একই সঙ্গে ক্ষতির সঙ্গে যেহেতু ব্যক্তির অভিপ্রায় জড়িত থাকে, এজন্য একে অভিপ্রায়জনিত ক্ষতিও বলা যেতে পারে।

খ. নৈতিকভাবে অপরাধ মানদণ্ড (moral iniquity standard) একজন ব্যক্তি যে মাত্রায় দুষ্টু কাজ করবে অথবা অন্যায় করবে সেমাত্রায় তাকে শাস্তি দিতে হবে। অন্যভাবে অপরাধী যেমাত্রায় অনৈতিক কাজ করবে সেই মাত্রায়ই তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এখানে শাস্তির দ্বিতীয় শর্তটি নিয়ে আমরা অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করতে পারি। যেমন, কোনো একজন ব্যক্তি দুষ্টু কিংবা অন্যের জন্য ক্ষতিকর তা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব? অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ দুষ্টু কাজ করেছে তার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই, অথবা সে ইচ্ছাকৃতভাবে দুষ্টুমি করেনি। অথচ তার মনোভাবগত সংকটের কারণে অনেকে হয়তো তাকে দুষ্টু ভেবে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। তিনি হয়তো শাস্তির জন্য যথোপযুক্ত নন। এরকম বিভ্রান্ত পরস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির দুর্বৃত্তায়ন কিংবা দুষ্টু কর্মকাণ্ড পরিমাপ করে ঠিক সেই মাত্রায় তাকে শাস্তি প্রদান করা খুবই দুরূহ কাজ। এজন্য অপরাধ নির্ধারণের জন্য নৈতিক মানদণ্ড গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হতে পারে আমরা শাস্তি দিই কেন? যে কারণেই শাস্তি দিই, অনেক সময়ই আমরা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে পারি না। শুধু তাই নয়, যিনি শাস্তি প্রদান করবেন তিনি কীভাবে বা কি কারণে শাস্তি দেবার অধিকার রাখেন? এসব বিষয়ও প্রতিশোধমূলক মতবাদে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি। এমন কী যে ব্যক্তিকে আমরা শাস্তি দেব তার দ্বারা কতোটুকু ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা গাণিতিক মাত্রায় হিসাব করাও সম্ভব নয়। এসব কারণে উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণটি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

গ. ন্যায়ের ভারসাম্য বিধান মানদণ্ড (Balance of Justice Standard). একজন ব্যক্তিকে সেই পরিমাণে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে যে পরিমাণে ন্যায়ের ভারসাম্য ঐ ব্যক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনগণের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের সময় ব্যক্তি যেটুকু অন্যায্য কাজ করবে ঠিক সে মাত্রায় তাকে শাস্তি বহন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারি। উন্নত বিশ্ব তাদের আয়েশি জীবন যাপনের লক্ষ্যে যে পরিমাণ দূষণ ও পরিবেশ সংকট সৃষ্টি করছে তা জলবায়ু পরিবর্তনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জলবায়ুর অসম পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ সমুদ্র উপকূলবর্তি দেশসমূহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা, ফলে বেড়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি। এরকম অসংখ্য সংকটের কথা বলা যাবে যা উন্নত বিশ্ব তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক লাভালাভের জন্য সৃষ্টি করছে। অথচ ক্ষতির

বোঝা বহন করতে হচ্ছে সেসব রাষ্ট্রকে যারা এসব উন্নয়নের ন্যূনতম কোনো ফল ভোগ করতে পারছে না। তাহলে লাভালাভের সঙ্গে বোঝা বহন না করাও একটি অন্যায্য কাজ। এই অন্যায্য কাজের শাস্তি হতে পারে ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান।

শাস্তি প্রসঙ্গে এ মানদণ্ডটির দাবি হলো আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে যার যেটুকু করণীয় সেটুকুর জন্য ফলভোগ বা শাস্তিভোগ জরুরি। অথচ আমাদের সামাজিক জীবনে প্রায়ক্ষেত্রেই ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে কোনো কর্মের শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করা সম্ভব হয় না। বিচারের রায় শুধু অপরাধের মাত্রার উপরই নির্ভর করে না। অপরাধীর পক্ষ বিপক্ষের যুক্তির মাত্রার উপরও বিচারের রায় নির্ভর করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় প্রকৃত অপরাধী মিথ্যা ও বিভ্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে অপরাধের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যান। এতে করে প্রকৃত অপরাধীর বিচার সেভাবে করা হয় না। যেকারণে প্রতিশোধমূলক শাস্তি সকল সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো কৃত-অপরাধের জন্য শাস্তির প্রতিশোধ কি হতে পারে? উক্ত প্রশ্নের জবাবে দার্শনিকদের মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান লক্ষ করা যায়। এই ভিন্নতা বিবেচনা করে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা প্রতিশোধমূলক শাস্তির স্বরূপ স্পষ্ট করার প্রয়াস নেব।

চার

প্রতিশোধমূলক শাস্তি সম্পর্কে দার্শনিক মতাদর্শ

শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশোধমূলক মতবাদটি অপেক্ষাকৃত অতি প্রাচীন। ল্যাক্স টেলিওনিস নীতি অনুসারে মনে করা হয় জীবনের জন্য জীবন, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত এবং পায়ের বদলে পা" এই হলো শাস্তির বিধান। শাস্তির এই ধরনটি আমরা প্রথম লক্ষ করি ব্যবিলনীয় সম্রাট হাম্বুরাবির (১৭৯২-১৭৫০ খ্রি.পূ.) সময়ে। "দ্যা কোড অব হাম্বুরাবি" নামে পরিচিত আইনের লক্ষ্য হলো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই আইনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক। যদি কোনো বিচারকের বিচারের রায় ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে ঐ বিচারককে শাস্তি হিসেবে ১২গুণ জরিমানা ও বিচার কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। আবার একজন চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার ফলে যদি রোগীর মৃত্যু হয় তাহলে ঐ ডাক্তারের হাত কেটে নেওয়া হবে। হাম্বুরাবি কোডের ১৯৬ থেকে ২০৫ পর্যন্ত কোডসমূহের মূলকথা হলো : "যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির চোখ তোলে নেয় তাহলে ঐ আক্রমণকারীরর চোখ তোলে নিতে হবে। একইভাবে যদি কারো হাড় ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে আক্রমণকারীরও হাড় ভেঙ্গে দিতে হবে। আর যদি কেউ কারো দাঁত ভাঙ্গে তাহলে সমবিচার হিসেবে তার দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে।"

---

৪ "an eye for an eye," "a tooth for a tooth", Core concept: the offender should suffer at least equally to the victim, Source : Lex talionis.

হাম্মুরাবি কোডের প্রভাব লক্ষ করা যায় প্রতিশোধমূলক মতবাদে । প্রতিশোধ মানে কাউকে আহত করা না। ন্যায়বিচার বাস্তবায়নই এর লক্ষ্য। ন্যায়বিচারের অর্থই হলো ন্যায্যতা। উক্ত মতবাদের দার্শনিক অবস্থান লক্ষ করা যায় কান্ট ও ব্রাডলের ভাবনায়। কঠোর অর্থে তাঁরা প্রতিশোধকে গ্রহণ করেননি।

ব্রাডলের আলোচনা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। ব্রাডলে তাঁর *Ethical Studies* গ্রন্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অপরাধীর নৈতিক দায়-দায়িত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের নৈতিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। নৈতিক দায়বোধের কারণে একজন ব্যক্তি নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ নৈতিক নীতি অনুসরণ করে কাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধী নৈতিক দায়দায়িত্বের উপর গুরুত্ব না দিয়ে অন্যকিছুর উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে থাকে। ধরা যাক, "মানুষ হত্যা করা অন্যায়" প্রত্যেক নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। সে জানে কীভাবে এই নীতির আলোকে কাজ করতে হবে। কিন্তু, কোনো ব্যক্তি যদি এই নিয়মানুসারে কাজ না করে তাহলে বুঝতে হবে সে জেনেশুনে নৈতিক দায়-দায়িত্বের বাইরে থেকে কাজ করছে। আর দায়িত্ব ভঙ্গের কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে এটাই স্বাভাবিক। এ শাস্তি পরিমাণের দিক থেকে অবশ্যই তুল্য শাস্তিই হবে।

শাস্তি সম্পর্কে ব্রাডলের অবস্থানটিকে অনেকেই প্রতিশোধমূলক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, শাস্তি সম্পর্কে ব্রাডলের অভিমত হলো : ব্যক্তি যদি তার দায়িত্ববোধ থেকে সরে যান তাহলে তার দায়-দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। একজন ব্যক্তি যে পরিমাণে দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিবেন ঠিক সেই পরিমাণে শাস্তি তাকে পেতে হবে। এটি প্রতিশোধমূলক মতবাদেরই একটি ভিন্ন সংস্করণ। তবে প্রতিশোধমূলক এই মতবাদটি দায়িত্ব-সংক্রান্ত নৈতিক নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ নীতিবোধসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি তার কর্ম নির্ধারণে স্বাধীন। সুতরাং, তিনি যে কাজই করবেন সেটি হোক স্বেচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক, তার দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত করে তাহলে ধরে নিতে হবে কাজটি সে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সম্পন্ন করেছে। আর স্বেচ্ছায় সম্পন্ন কাজের নৈতিক দায়-দায়িত্বও ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। ব্রাডলের শাস্তি মতবাদ কি সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় কোনো ইতিবাচক ফল আনতে সক্ষম? তিনি যে দায়িত্ববোধের প্রস্তাব করেছেন তা কি শাস্তির গ্রহণযোগ্য কোনো অবস্থা তৈরি করে? এবিষয়সমূহ তলিয়ে দেখার আগে আমরা বোঝে নিতে পারি দায়িত্ববোধ স্বেচ্ছাকৃত কি-না? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের

---

9 The Code of Humborabi, Code: 5.
10 The Code of Humborabi, Code : 219.
11 The Code of Humborabi
12 Bradley, F.H. 1988 (1876). Ethical Studies, Oxford: Clarendon Press.
13 Davis, M., 1986. 'Harm and Retribution', Philosophy and Public Affairs,15, p. 236;
Day, J.P. 1978. 'Retributive Punishment', Mind, 87, p. 499.
Hershenov, D.B., 1999. 'Restitution and Revenge', Journal of Philosophy, 96 (1999).
Hershenov, D.B., 2000. 'Punishing Failed Attempts Less Severely Than Successes', Journal of Value Inquiry, 34, p. 482.

দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে, অনেক কাজ রয়েছে যাতে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব নেই। যে কাজে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই সেই কাজের দায় ব্যক্তির উপর কেন পড়বে? শুধু তাই নয়, অনেক কাজ রয়েছে যা আমরা প্ররোচনা, প্রণোদনা ও লালসা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকি। সূক্ষ্ম বিবেচনায় এসবই হলো বাহ্যিক প্রভাবক। এসব প্রভাবকের ভূমিকা রয়েছে বলেই আমরা স্বেচ্ছাকৃত কোনো অপরাধের অস্তিত্ব সনাক্ত করতে পারি না। যদি স্বেচ্ছাকৃত কোনো অপরাধের অস্তিত্ব নাইবা থাকে তাহলে অপরাধের দায় ব্যক্তিকে কেন বহন করতে হবে? যদি ধরে নিই ব্রাডলেই সঠিক তাহলে এটাও সঠিক যে, স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের দায়ে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এর অর্থ হবে ব্রাডলের মতবাদ প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিকোণকেই সমুন্নত করে।

সমালোচকের মতো থম ব্রুকস প্রশ্ন উঠিয়েছেন : ব্রাডলে যথার্থ অর্থে প্রতিশোধমূলক মতবাদের প্রবক্তা কি-না। ব্রুকস মনে করেন, অনেক বৃটিশ দার্শনিকদের মতো ব্রাডলে প্রতিশোধবাদী নন। অন্যান্য বৃটিশ দার্শনিক যেমন টি. এইচ গ্রিন, বোসাঙ্কয়েট ও জেমস সেথের মতো তিনিও মনে করেন, যেকোনো আইনীয় শাস্তির লক্ষ্য হতে হবে সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংহতি রক্ষা করা। ব্রাডলে চিন্তার এধারাটিকে বুঝতে পারলে তাকে আর প্রতিশোধবাদী ভাবার কারণ থাকে না। প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আমরা তাঁর *Ethical Studies* গ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করতে পারি। তাঁকে ভুলভাবে পাঠ করার কারণ হলো উক্ত গ্রন্থের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি : [Punishment is punishment, only when it is deserved. We pay the penalty, because we owe it, and for no other reason; and if punishment is inflicted for any other reason whatever than because it is merited by wrong, it is a gross immorality, a crying injustice, an abominable crime, and not what it pretends to be.]

তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, শাস্তি পাবার যৌক্তিকতা দেখা দিলে কিংবা কারো আচরণের কারণে যদি তা প্রত্যাশিত হয় তাহলে তা শাস্তিই। অন্যকোনো কারণে নয়, বরং আমরা প্রত্যাশা করি বলেই তা প্রাপ্য। যেকোনো কারণে শাস্তি আরোপিত হোক না কেন তা অবশ্যই ব্যক্তির কৃত ত্রুটির কারণে হতে হবে। অনৈতিক কাজ, অন্যায্য আচরণ ও ন্যাক্কারজনক অপরাধের জন্য অপরাধীর অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত। ব্রাডলের এরকম দাবি থেকে অনেকেই তাকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে দাবি করেন। উপর্যুক্ত উক্তির ব্যাখ্যা থেকে অনেকে মনে করেন, আমরা যদি অপরাধীকে শাস্তি না দিই তাহলে হয়তো ভবিষ্যতের অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা যাবে না, এনমনকী বৃহত্তর কোনো সাধারণ মঙ্গল বয়ে আনতেও তা ব্যর্থ হবে। অপরাধী অবশ্যই তার কৃত-অপরাধের জন্য শাস্তি পাবেন। কিন্তু এমন কেউ যদি শাস্তি পায় যিনি তা পাবার মতো নয়, তবে সেটা জঘণ্য অপরাধ হবে। নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হলো অনৈতিক ও জঘন্য অপরাধ।

ব্রাডলকে প্রতিশোধমূলক মতাদর্শের প্রবক্তা দাবি করার পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে। শাস্তি সম্পর্কে তাঁর দুটি অবস্থান রয়েছে : ১. স্থূল দৃষ্টিকোণ (the vulgar) ও ২. অনিবার্যতাবাদ (necessitarianisn)। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধও রয়েছে। ব্রাডলে বলছেন, শাস্তি দেওয়া প্রসঙ্গে স্থূল দৃষ্টিকোণটি অপরাধীর ফৌজদারী অপরাধকে বোঝায়, যার শাস্তি তাকে বাধ্যতামূলকভাবে পেতে হয়। এ প্রাপ্তিটি একেবারেই অপরাধের স্বগুণে প্রাপ্য। অন্যদিকে অনিবার্যতাবাদ বোঝায় শাস্তি কখনোই তার স্বগুণে প্রাপ্তির দাবি রাখে না। এমনকী এর ন্যায্যতাও আমরা প্রতিপাদন করতে পারি না। এটি বরং বাহ্যিক কিছু পাবার উপায় মাত্র। প্রথম দৃষ্টিকোণটিতে শাস্তির সঙ্গে অপরাধের যে সম্পর্ক দেখানো হচ্ছে তা একান্তই এর অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে। সম্পর্কের অন্তনিহিত দিকটিই এর প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে। আবার বাহ্যিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে শাস্তিকে দেখার কারণে ব্রাডলে তার আদি প্রতিশোধবাদী অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবনা যা অনিবার্যতাবাদ (necessitarian) হিসেবে পরিচিত। এ বিচ্যুতির কারণেই তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিশোধমূলক মতাদর্শের প্রবক্তা বলা যায় না। তিনি স্টুয়ার্ট মিলের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে বলেন, শাস্তি কখনোই অপরাধীর জন্য কাঙ্খিত নয়। বরং শাস্তি অনেকসময়ই সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। এটি আবার রাষ্ট্রের বৈধ আইনীয় ব্যবস্থারও অন্তর্ভুক্ত।

১৮৯৪ সালে ব্রাডলে তাঁর Some Remarks on Punishment প্রবন্ধের মাধ্যমে পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে বের হয়ে এসেছেন। এ অবস্থাটি একেবারেই প্রতিশোধ বিরোধী। উক্ত প্রবন্ধে তিনি তিনটি অবস্থান নিয়েছেন :১. প্রতিশোধমূলক মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান, ২. সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণা রীতির মানোন্নয়ন ও ৩. প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের কাছেই শাস্তি হলো গৌণ উৎস। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মঙ্গল ও কল্যাণ বাস্তবায়ন হলো প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। অপরাধীকে যখন শাস্তি প্রদান করা হয় তখন লক্ষ্য থাকে অন্যদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করা। এই কল্যাণ কতোটা সর্বোচ্চকরণ করা যায় তাই বিবেচ্য বিষয়। ব্রাডলের দর্শনের এই বিবেচনার কারণে শেষতক আর তাঁকে প্রতিশোধমূলক মতাদর্শের প্রবক্তা বলা যায় না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কান্টের মতবাদটি বিবেচনা করতে পারি। কান্ট শাস্তি সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমী ধারণার কথা বলেছেন। কান্ট কেন এরকম একটি বিকল্পের কথা ভেবেছেন? প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি : প্রতিশোধমূলক মতবাদ যেভাবে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে গাণিতিক সমতা আনতে চেষ্টা করে, তাতে অপরাধের মাত্রা নির্ণয়ের

14 Brooks, Thom, 2011, "Is Bradley a Retributivist?" History of Political Thought, 32 (1), pp.83-95.
15 Bradley, Ethical Studies, pp. 26-7.
16 Bradley,Ethical Studies,p.30.
17 Mill, John Stuart. Utilitarianism. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1979. Shafer-Landau, Russ. "The Failure of Retributivism." In Philosophy of Law. Ed. Joel Feinberg and Jules Coleman. Belmont, CA: Wadsworth/Thompson Learning, 2000. 769-779.
18 Bradley, F.H., 1894. 'Some Remarks on Punishment', International Journal of Ethics,4, pp. 269-84.

পাশাপাশি অপরাধীর শাস্তির ধরন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। ফলত অপরাধীর শাস্তিবিধান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরকম সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে কান্ট শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সুপারিশ করেছেন। এই সামঞ্জস্য বিধানের পাশাপাশি তিনি আইনগত যুক্তির বিষয়টিও সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি দাবি করেন, কোনো অপরাধীকে কি ধরনের শাস্তি দিতে হবে তা নির্ভর করে অপরাধের আইনগত ভিত্তির উপরে। যদি ধরা হয় একজন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় আমাদের সুখ বৃদ্ধির জন্য, তাহলে স্পষ্টতই এখানে কান্টের "শর্তনিরপেক্ষ আদেশের নীতি" লঙ্ঘন করা হয়। কারণ সুখ লাভের জন্য যদি কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে শাস্তি সম্পর্কে যে কোনো উপযোগবাদী মতবাদ অসন্তোষজনক।

কোনো অপরাধীর বিচারের রায় যদি শাস্তি হয় কখনোই তা প্রাপ্ত সুখের মাত্রার উপর নির্ভর করবে না। অপরাধীর শাস্তি দেবার বিষয়টি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর : ক. কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধ করে তাহলে তার শাস্তি পাওয়া উচিত, অন্য কোনো কারণে নয় বরং অপরাধের দায়ে। খ. শাস্তিকে অবশ্যই অপরাধের সঙ্গে সমানুপাতিক হতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে অপরাধের সঙ্গে শাস্তির সমানুপাতিক হওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? "মৃত্যুর বদলে মৃত্যু", কিংবা "আঙ্গুলের বদলে আঙ্গুল"? নাকি অন্যকিছু? কান্ট দাবি করেন, গাণিতিক হিসেবে অপরাধের বদলে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব নয়। তাহলে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কীভাবে সমতাবিধান করা সম্ভব? এ প্রশ্নটির একটি যুৎসই সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন ইমানুয়েল কান্ট।

শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে কীভাবে সমতাবিধান করব? কান্ট তাঁর *Groundwork for the Metaphysics of Morals* গ্রন্থে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে কিংবা শান্তভাবে কাউকে গালমন্দ করলেন। তার গালমন্দে ঐ ব্যক্তি অপমানিত বোধ করলেন। এখন এই অপমান করার দায়ে অপরাধীকে কিধরনের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে? কেউ হয়তো প্রস্তাব করবেন কাউকে অপমানের বদলে অর্থদণ্ড হতে পারে শাস্তির সমতুল্য বিচার। প্রশ্ন হতে পারে অপমানের সঙ্গে অর্থের কী সম্পর্ক? আর অপমান ও অর্থ যদি সমতুল্যই হয় তাহলে সমাজের অনেক বিত্তবান মানুষজন অন্যদের অহরহ অপমান করবেন এবং অর্থের বিনিময়ে তা শুধরিয়ে নিবেন। এতে করে প্রকৃত শাস্তির ধারণাই পাল্টে যাবে। শাস্তির এরকম ধরনের পরিবর্তে কান্ট একটি বিকল্প প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, অপমানকারীর জন্য শাস্তির বিধান থাকতে পারে। যিনি অপমানিত হয়েছেন অপমানকারীকে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে প্রকাশ্যে। অপমানিত ব্যক্তির হাত ধরে অপমানকারী চুম্বন করবেন এতে করে শাস্তির বিধানটি সমতাভিত্তিক হবে। কারণ প্রকাশ্যে ক্ষমা ও চুম্বনের মধ্য দিয়ে অপমানকারী তাঁর অপরাধের মাত্রাটি বুঝতে সক্ষম হবেন। ফলে অপমানকারীর আত্মদম্ভও আঘাতপ্রাপ্ত হবে। ক্ষমা চেয়ে অপমানিতের হাত চুম্বন করার অর্থ হলো তার হৃত সম্মান উদ্ধার করা। উভয় ঘটনায় অপমানিত তার মর্যাদা

ফিরে পাবেন, আর অপমানকারী আত্মদম্ভের স্খলন ঘটবে। এর মধ্য দিয়ে একটি সমতুল্য শাস্তি হয়েছে দাবি করা যাবে।

শাস্তি সম্পর্কে কান্টের উপর্যুক্ত মতাদর্শটি প্রতিশোধমূলক। তবে এ প্রতিশোধ সাধারণ বদলা নেওয়ার অর্থে নয়, বরং লঘু অর্থে। মাথার বদলে মাথা, নখের বদলে নখ ইত্যাদি হলো বদলা নেওয়ার সমপর্যায়ভুক্ত। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির প্রতিহিংসারও প্রতিফলন ঘটবে। কান্ট মনে করেন, প্রতিহিংসা প্রচণ্ডরকমভাবে ঘৃণ্য। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে অন্যদেরকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা না করে মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এই "মাধ্যম" হওয়ার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির মর্যাদা ব্যহত হয়। সুতরাং, কান্ট বদলা নেওয়ার নিয়মের মধ্যে যাননি। কারণ বদলা কিংবা প্রতিশোধ উভয়ই মানব মর্যাদাকে ব্যহত করে। তারপর তিনি লঘু অর্থে প্রতিশোধমূলক মতবাদের পক্ষপাতি। তিনি মনে করেছেন, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে, তবে সেই শাস্তি থেকে ব্যক্তি যেন শিক্ষা লাভ করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিখণের মাধ্যমে অপরাধী নির্ভুল ও ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

কান্ট ও ব্রাডলের দার্শনিক মতকে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: ক. ব্রাডলের অবস্থানকে "দায়িত্ববোধের নীতি" (the principle of responsibility), খ. কান্টের অবস্থানকে "সমতাবিধানের নীতি" (the principle of propotionality) হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। দায়িত্ববোধের নীতিটি দাবি করে যে, বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। আর ব্যক্তি যদি স্ব-ইচ্ছায় কোনো অপরাধ করে তাহলে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবার কারণে তাকে শাস্তি দিতে হবে। প্রত্যেকের নৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়াই দায়িত্ব পালনের একটি অর্থ। ব্যক্তি যদি এই নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় তাহলে শাস্তি ভোগ করা বাঞ্ছনীয়। শাস্তি বিধানের এই ধারাটি প্রতিশোধমূলক। কারণে এ মতবাদ আমাদেরকে বলতে চাই যে, সত্যিকার অর্থে যিনি শাস্তি পাবার যোগ্য তাকে কখনই এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। কোনো অপরাধের দায়ে শাস্তিভোগ করা উচিত একারণে যে, দায়িত্বহীনতা অনেকের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ ক্ষতি অনেকসময় পুষিয়ে দেয়াও সম্ভব নয়। একারণে শাস্তি প্রাপ্য হতে পারে। দায়িত্বহীনতার মধ্যেই রয়েছে অপরাধের উৎস। অপরাধের পরোক্ষ অর্থই হলো শাস্তি প্রদান। শাস্তির এই স্বরূপের কারণে

---

19 Kant, I. 2005. Groundwork for the Metaphysics of Morals, trans. Thomas K. Abbott, revised by Lara Denis, Broadview, p.155-6

20 *কান্ট তাঁর শর্তনিরপেক্ষ আদেশের দ্বিতীয় শর্তে বলেন "মানুষকে মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে"। তাঁর এই নীতিটিকে অনেকসময় মানব মর্যাদার শর্ত হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি অনেক কান্ট বিশেষজ্ঞ যেমন অ্যালান কসগার্ড এবং টমাস হিল কান্টের উক্ত সূত্রটিকে "ফর্মূলা অব হিউম্যানিটি" হিসেবে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন :*

Hill, Thomas E., Jr., 1992, Dignity and Practical Reason in Kant's Moral Theory, Ithaca, NY, Cornel university Press.

Korsgaard, Chritine.1986, "Kant's Formula of humanity", Kant-Studien , Volume 77 (1-4).

Paton, H. J. 1947, The Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy, London, Hutchison.

ব্রাডলে একে স্বনিহিত লক্ষ্য (ends–in-itself) হিসেবে উল্লেখ করেন। দায়িত্ববোধ নীতির অনুসারী হিসেবে তিনি মনে করেছেন, শাস্তি দেবার ফলে সমাজের কোনো কল্যাণ হবে কি-না, কিংবা কারো ব্যক্তিগত কোনো লাভালাভ হবে কি-না তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং শাস্তিটি যদি স্বনিহিত অর্থে কারো প্রাপ্য হয় তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

প্রতিশোধমূলক শাস্তির আরেকটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি "সমতাবিধানের নীতিতে"। এই নীতিটি কঠোর অর্থে প্রতিশোধমূলক নীতি নয়। মতাদর্শিগণ মনে করেন, শাস্তির তীব্রতা ও অপরাধের গুরুত্ব এই দুটির মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক থাকা চাই। আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিই কোনো একজন ব্যক্তিকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে তাহলে এখানে বিবেচনায় রাখতে হবে : কেন মৃত্যুদণ্ড? কঠোর প্রতিশোধমূলক মতাদর্শি হয়তো ভাবতে পারেন অপরাধী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, অন্যের জীবন সংহার করেছে। এই অপরাধের দায়ে মৃতুদণ্ড হওয়াই বাঞ্ছণীয়। সমতাবাদও মনে করে, কাউকে অপরাধের দায়ে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। তবে এখানে দুটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে :

প্রথমত, যিনি অপরাধী, তার অপরাধের মাত্রা ও যথার্থতা নির্ধারণ করা খুবই জরুরি,

দ্বিতীয়ত, অপরাধের মাত্রা অনুসারে তাকে অবশ্যই ঐ মাত্রায় শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু বদলা নেওয়ার অর্থে, কিংবা প্রতিহিংসার অর্থে যেন কোনো শাস্তি দেওয়া না হয় সেদিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

এপ্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি বিকল্প উদাহরণ বিবেচনা করতে পারি। দশ বছরের একটি শিশু পরিস্থিতির কারণে অপরাধ করেছে, কিংবা একজন পাগল উন্মাদ অবস্থায় কাউকে হত্যা করেছে, কিংবা কোনো একজন ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় কারো মাথায় আঘাত করেছে। এরকম বহু কারণে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি কীভাবে বিবেচনা করা হবে? এ প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক আইনের সহায়তা নিতে পারি। যেমন, শিশুদের শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে তার বয়স ও পরিপূর্ণতার দিকটি বিবেচনায় রাখতে হবে। পাগল কিংবা উম্মাদের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধানটিও কোনো কারণে সাধারণ শাস্তির মতো বিবেচনা করার সুযোগ নেই। এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়–বদলা নেওয়া কিংবা প্রতিশোধ নেওয়াকে শাস্তির নৈতিক কোনো অবস্থা বলা যায় না। বদলা, কিংবা যে-মাত্রার অপরাধ সেই মাত্রার শাস্তি, অথবা প্রতিশোধ এসবকিছুর যে আরো বিকল্প রয়েছে তা প্রতিশোধমূলক মতবাদে যাথার্থ অর্থে অনুসৃত হয়নি।

কান্ট ও ব্রাডলের প্রতিশোধ মতবাদের এসব সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নতুন বিকল্প দার্শনিক পথ অনুসন্ধান করতে পারি। এই অনুসন্ধানে অনেকে মনে করেন হেগেলের দার্শনিক চিন্তায় প্রতিশোধমূলক ধারণা পাওয়া যায়। হেগেল শাস্তি সম্পর্কে ফয়েরবাখ ও সিজেরো বেকারিয়ার মতামতের একটি বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন মাত্র। এ বিশ্লেষণে তাঁকে প্রতিশোধাত্মক (retributionist) হিসেবেই মনে হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে জেনে নেব শাস্তি সম্পর্কে ফয়েরবাখের বক্তব্য কি? হেগেল তাঁর গ্রন্থের ৯৯ অনুচ্ছেদে বলছেন,

21 Hegel, W., 1991.Elements of the Philosophy of Right, ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press.

ফয়েরবাখের শাস্তি সম্পর্কিত মতামতটি ত্রাসন ও ধমকের (threat) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন হতে পারে—ত্রাসন ও ভয় প্রদর্শন কী সকলসময় ভালো ফলাফল দিতে পারে? প্রকারান্তরে ত্রাসন ও ভয় প্রতিশোধকেই ইঙ্গিত করে। কোনো একজন ব্যক্তি অপরাধ করলো, অথচ সে জানে অপরাধ করলে তার উপর শাস্তি নেমে আসবে। অথচ সে অপরাধ করছে। এরকম মনোভাবকে কি ত্রাসন ও ভয় দেখিয়ে পরিবর্তন করা যাবে? এরকম প্রেক্ষাপটে আরো যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক তা হলো : শাস্তির ভয় কতোটা ব্যক্তি অধিকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? এসব প্রশ্নের তিনি যে উত্তর অনুসন্ধান করেছেন তাতে তাঁকে সংশোধনবাদী হিসেবেও মনে হতে পারে। এপ্রসঙ্গে হেগেল বলতে চাচ্ছেন, ব্যক্তির কাজের পেছনে কোনোকিছুর ভয় রয়েছে অথবা শাস্তির আতঙ্ক রয়েছে এর অর্থই হলো মানুষ স্বাধীন মুক্ত নয়। মন্দ ও অন্যায়ের উপস্থিতি অনুসন্ধান করেই কেবল আমরা চাপমূলক নীতিকে সামনে নিয়ে আসি। অথচ অধিকার ও ন্যায়পরতাকে বুঝতে হবে ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে। ধমক বা আতঙ্কের মধ্যে স্বাধীনতার অনুপস্থিতি রয়েছে। শাস্তির ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে আলাদা রাখার অর্থ হলো প্রথমে তার অধিকার ও স্বাধীনতাকে শঙ্কাগ্রস্ত করা। শাস্তি সম্পর্কে ফয়েরবাখীয় এ বিশ্লেষণকে হেগেল সংক্ষেপে বলছেন, "শাস্তি হলো কুকুরের সামনে একটি লাঠি উচিয়ে রাখার মতো।" এর অর্থ হলো মানুষকে অ-মানবীয় করে ফেলা। এখানে মানব মর্যাদা, মানুষ হিসেবে সম্মান, ও তার স্বাধীনতা ও অধিকার পুরোপুরো অর্থেই বিপন্নতার শিকার হয়। তবে, ভয় বা ধমক অনেকসময় শান্ত ও নিরীহ মানুষদের কল্যাণ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

শাস্তি কিন্তু পরিণতিতে ভয়, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা যেন মূখ্য না হয়ে উঠে, এই হলো হেগেলের শাস্তি সম্পর্কে মূলকথা। শাস্তির বিধান থাকবে। এবিধান না থাকলে সমাজ অপরাধীদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠবে। অপরাধীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই শাস্তি। তবে শাস্তির একমাত্র লক্ষ্য যেন অপরাধীকে ভয় দেখানো, কিংবা দুঃখ যন্ত্রণা দেওয়া না হয়। শাস্তি হতে হবে একান্তই অপরাধীর চিত্তশুদ্ধির মাধ্যম। শাস্তি অপরাধীর মধ্যে যে অনুশোচনা সৃষ্টি করবে তা তাতে নতুন করে ভাবতে শেখাবে। এই শিক্ষার কারণে সে ভবিষ্যতের অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। পরিণতিতে শাস্তি সম্পর্কে হেগেলের এই ভাবনা সংশোধনবাদ ও প্রতিকারবাদীদের মাঝামাঝি একটি অবস্থা । এই অবস্থায় একজন অপরাধী সারাক্ষণ শাস্তির ভয়ে তটস্থ থাকবেন না। আবার, অপরাধ করলে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান অপরাধীকে পুনর্বাসন করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে তাও সঠিক নয়। এই দুইয়ের মাঝামাঝি হেগেলে অবস্থান নিয়েছেন। একদিকে তিনি শাস্তি দেবার পক্ষে, তবে সে শাস্তি যেন আতঙ্ক কিংবা নিপীড়নের পর্যায়ে না পড়ে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। আবার অতিরিক্ত উদারবাদী হবার সুযোগও তিনি রাখেননি। সবমিলিয়ে বলা যায়-হেগেলের শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদ হলো একটি মধ্যমপন্থা। এটিকে আমরা নব্য-সংশোধনবাদ হিসেবেও বিবেচনা করতে পারি।

উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, দার্শনিকভাবে ব্রাডলে, কান্ট ও হেগেলকে অনেকেই প্রতিশোধমূলক মতাদর্শি হিসেবে মনে করে থাকেন। আবার এদের উভয়ই প্রতিকার ও সংশোধনের প্রস্তাবও করেছেন। এই প্রস্তাবনায় শাস্তির বৈচিত্রসমূহ তাঁরা মেনে নিয়েছেন। এই মেনে নেবার প্রসঙ্গটি ইঙ্গিত করে শাস্তির চূড়ান্ত অর্থ প্রতিশোধ নয়, অন্যকিছুও রয়েছে। এ রকম সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

চার

প্রতিশোধই কী শাস্তির চূড়ান্ত অর্থ?

প্রতিশোধমূলক মতবাদে শাস্তির মূলকথাই হলো 'বদলা'। সাদামাটাভাবে এ মতবাদ যে কথাটি বলতে চায় তাহলো কোনো অপরাধী যদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে তাকে হত্যা করাই ন্যায্যবিচার। এ বিবেচনায় প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধই হলো শাস্তির মূল লক্ষ্য। কিন্তু, শাস্তি সম্পর্কে এই মতবাদটি কঠোর কিংবা মানবতার্বজিত হয়ে যায় কি-না সে প্রসঙ্গটিও সামনে চলে আসে। কেন মৃত্যুর বদলে মৃত্যু? প্রতিশোধমূলক মতাদর্শিগণ দাবি করেন, শাস্তি হলো দৃষ্টান্তমাত্র। আর দৃষ্টান্ত এমনকিছুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা আমাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে শেখায়। যেমন, কেউ যদি হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধ করে তাহলে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। এই বদলাটি অন্যদের জন্য শিক্ষা। এ শিক্ষা এমন যে তা বলে দেয় আপনি এরকম অপরাধ করবেন না, যদি করেন তাহলে আপনার উপরও এ শাস্তিটি নেমে আসবে। এ শিক্ষা অন্যদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। ভয়ের কারণে ব্যক্তি হয়তো অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন। প্রশ্ন হলো ব্যক্তি ভয়ের কারণে অপরাধ থেকে দূরে থাকবে, নাকি ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্বাবোধের কারণে অপরাধ থেকে দূরে থাকা উচিত? ভয় ও ঔচিত্য মাত্রাগতভাবে ভিন্ন। 'ভয়' ও 'নৈতিক দায়িত্ববোধ' এক নয়। একজন ব্যক্তি ভয়ের কারণে কোনো একটি কাজ থেকে বিরত থাকলেন, আর নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে বিরত থাকলেন এ দুটি কোনোভাবেই সমপর্যায়ের নয়। যদিও উভয়ক্ষেত্রেই ব্যক্তি অপরাধ থেকে বিরত থাকছেন। তবে আমাদের মনে রাখতে যে, নৈতিকতার অপরিহার্য শর্ত হলো ব্যক্তির কর্ম করার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয় দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ববোধ তাকে উজ্জীবিত করে ভালো কাজ করার জন্য। একই সঙ্গে উজ্জীবিত করে অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য। এভাবে সম্পাদিত কাজ ভয়ের দ্বারা তাড়িত কাজের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। ভয় বা ভীতি নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না। নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্যতম শর্ত। কিন্তু, প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রচণ্ডরকমভাবে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। যা আদর্শিকভাবে নৈতিক নীতির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি—প্রতিশোধমূলক শাস্তি মতবাদের কঠোর ও লঘু উভয় ধারাই রয়েছে। ব্রাডলে'র দায়িত্ববোধ নীতি ও কান্টের সমতানুপাতিক নীতি যদি শাস্তির কঠোর অর্থকে সামনে নিয়ে আসে তাহলে তা নৈতিকতার ন্যুনতম কোনো শর্ত পূরণ করে না।

একারণে এমতবাদ পরিপূর্ণ নৈতিক মতবাদের দাবি রাখে না। প্রতিশোধমূলক মতবাদের আরেকটি ব্যর্থতা হলো মানবতা অপেক্ষা নৈতিক নীতিকে উর্ধ্বে তোলে ধরা। যে নীতি মানুষ ও মানবাধিকারকে গুরুত্বহীন করে দেখে সে নীতি কখনোই মানব সমাজের সুফল বয়ে আনতে পারে না। এই অভিযোগের পুরোটাই প্রতিশোধমূলক শাস্তির বিরুদ্ধে যায়। প্রতিশোধের মানসিকতাই যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে অভিবাদন জানানো। এই অভিবাদন স্পষ্টত মানবতা ও মনুষত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

প্রতিশোধমূলক মতবাদের আরেকটি ব্যর্থতা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মতবাদের মৌলিক নীতি হলো "ন্যায্যতার প্রতিফল নীতি" (Principal of just requital) । এই নীতিটি এমন যে, অপরাধী দ্বারা কোনো ব্যক্তি যতটুকু ক্ষতির শিকার হবেন ঠিক ততোটুকু ক্ষতি অপরাধীকে প্রতিফল হিসেবে প্রদান করাই ন্যায্যতা। প্রশ্ন হলো এই নীতিটি মানবসভ্যতার যথাযথ বিকাশের জন্য কতোটুকু ফলদায়ক? ধরা যাক, কোনো অপরাধী কারো অকল্যাণ করল। এক্ষেত্রে প্রতিশোধমূলক মতবাদ দাবি করবে অপরাধীকে সমমাত্রার অকল্যাণ ফিরিয়ে দেওয়া। রহিম যদি করিমের ক্ষতি করে তাহলে এ মতবাদের দাবি হলো ঠিক সমপরিমাণ ক্ষতি রহিমেরও ভোগ করতে হবে। এখানে অকল্যাণের বদলে অকল্যাণ ও ক্ষতির বদলে ক্ষতিই হলো মূলনীতি। কারো ক্ষতি পরিণতিতে অকল্যাণ। এই ক্ষতি অনেকসময় দ্বিগুণ অনুপাতে বাড়তে থাকবে। একটি ক্ষতি, একটি অকল্যাণ প্রতিশোধের নামে দুটিতে পরিণত হবে। এভাবে দুটি চারটিতে। ফলে ক্ষতির হার পৌনঃপৌনিক হারে বাড়তে থাকবে। ক্ষতি ও অকল্যাণ সমাজের জন্য চিরস্থায়ী কোনো মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারে না। এই যৌক্তিক সমস্যাটি সামনে নিয়েই প্রতিশোধমূলক মতবাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা তো সমাজে অকল্যাণ বৃদ্ধি করতে চাই না। সামাজিক জীবনে মানুষের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই আমাদের কাজ করা উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা জার্মান রাজনৈতিক কর্মি রোজা লুক্সেমবুর্গ (১৮৭১-১৯১৯) এর "Against Capital Punishment" প্রবন্ধ অনুসারে অগ্রসর হতে পারি। লুক্সেমবার্গ মনে করেন, অপরাধ ও শাস্তি উভয়ের শেকড় আমাদের সমাজের গভীরে প্রোথিত। এজন্য প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থায় কিভাবে অপরাধী সনাক্ত করা যায় তাও আলোচনার দাবি রাখে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ধরে লুক্সেমবার্গ দেখান বিভিন্ন সমাজে যখনই কেউ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন তখনই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এই অভিযোগ দাঁড় করায় কর্তৃত্ববাদী গোষ্ঠী। রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইন কতৃত্ববাদীদের স্বার্থে দাঁড়ায়। আর আন্দোলনকর্মীদেরকে আইনভঙ্গের দায়ে শাস্তি প্রদান করা হয়। শাস্তির ইতিহাস কার্যত প্রকৃত অপরাধী নির্মূলের জন্য নয়। শাস্তি হয়ে উঠে শক্তিশালী গোষ্ঠীর ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম হিসেবে। ঐতিহাসিক এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে লুক্সেমবার্গ শাস্তির আনুপাতিক বিবেচনার বিরুদ্ধে। এপ্রসঙ্গে তিনি যুদ্ধের দৃষ্টান্তও নিয়ে এসেছেন। ইতিহাসের দীর্ঘ খুঁটিনাটি বিচার করে দেখান যুদ্ধও সমাজের ক্ষমতাসীন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, সমাজ যাদের অধীনে তাদের স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ

যুদ্ধের ভেতর দিয়ে হতদরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে ঠেলে দেয়া হয় নির্যাতনের সীমানায়। পরিণতিতে শক্তিশালী গোষ্ঠী থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। রোষানলে পতিত হয় অসহায়, নিরীহ জনগণ। লুক্সেমবুর্গ এ অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে:

The justice of the bourgeois classes had again been like a net, which allowed the voracious sharks to escape, while the little sardines were caught. The profiteers who have realized millions during the war have been acquitted or let off with ridiculous penalties. The little thieves, men and women, have been punished with sentences of Draconian severity.

তিনি মনে করেন, অপরাধ ও শাস্তির স্বরূপ নির্ধারিত হবে সামাজিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিত থেকে। সামাজিক জীবনের বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোই হবে শাস্তি প্রদানের পূর্বশর্ত। কিন্তু ড্রাকোনিয়ান আইন শাস্তির এসব পূর্বশর্তকে হেয় করে থাকে। এর পরিবর্তে তিনি মনে করেছেন, আমাদের উচিত কর্মতৎপরতা ও আদর্শকে সামাজিক জীবনের মূলে নিয়ে আসা। এই আদর্শই পারবে সমাজ দেহ থেকে অপরাধকে নির্মূল করতে। আর জীবন সেটা হোক একটি ঘাসফড়িং-এর, তা মাড়িয়ে যাওয়া অন্যায়, অপরাধ।

শাস্তি দেবার পূর্বে সামাজিক জীবনের সংহতি ও মানবতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন লুক্সেমবার্গ। অথচ প্রতিশোধমূলক মতবাদের কঠোর অর্থ প্রত্যাঘাতকে উৎসাহিত করে থাকে। শাস্তির ন্যুনতম কোনো বিকল্প বিবেচনা না করে অপরাধীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করা হয়ে উঠে প্রতিশোধমূলক মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য। শত্রুর মোকাবেলায় নিজের জীবন যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলে বাঁচার তাগিদে কেউ হয়তো আঘাত করতে পারেন। আঘাতকারীর কোনো অভিপ্রায় না থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। অভিপ্রায়হীন এ মৃত্যুর দায় কে নেবে? প্রতিশোধমূলক মতবাদ এক্ষেত্রে নির্বিচারী। তারা বলবেন—যিনি হত্যার জন্য দায়ী তাকেই এর দায় নিতে হবে। দায়ী ব্যক্তির শাস্তি হলো : আঘাতের সমতুল্য প্রত্যাঘাত। অথচ অপরাধী যে বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয় এ মতবাদে সেসব বিবেচনা গুরুত্ব পায় না। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন বিকল্প রাখতে হয়, তেমনি এ বিকল্প গ্রহণের সময় বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়।

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আধুনিক জীবন হলো জটিল। জটিলতার আবর্তে যেকোনো চিন্তাকে অবশ্যই এর সঙ্গে অভিযোজন করতে হবে। এই অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিচক্ষণ হওয়া। প্রশ্ন হলো শাস্তি প্রসঙ্গে প্রতিশোধামূলক মতবাদ কী এই বিচক্ষণতা (prudence) ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অভিযোজন (adaptation) করতে সক্ষম? প্রতিশোধমূলক মতবাদকে অবশ্যই এপ্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হবে। আধুনিক বিশ্বের মৃত্যুদণ্ডের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বোঝে নিতে পারি। বর্তমান

22 Luxemburg, Rosa, 1918, "Against Capital Punishment", collected from Socialist Review, Vol. 30, No.1, January-February 1969, pp.5-6, translated by William L. McPherson ((from the French which was from the original in German) edited by Maurice Berger.
23 Luxemburg, Rosa, 1918.

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এমনকী ২০০৩ সালে ২৪ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন তার প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের নিকট আবেদন পাঠিয়েছে তারা যেন মৃত্যুদণ্ড প্রথা বিলোপ করে। এসবকিছু মিলিয়ে বলা যায়–পলিসি হিসেবে শাস্তির প্রতিশোধমূলক বিধানটি বিচক্ষণ কিংবা সর্বজন সমর্থিত নয়। এ মতবাদ আধুনিক ও মানবিক বোধসম্পন্ন সামাজিক জীবনে সাদরে গৃহীত হবার কথা নয়।

২০১৫ সালে সৌদি আরবে আট বাংলাদেশিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর সভ্য জাতিরাষ্ট্রসমূহ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সংস্থা নিন্দা জানিয়েছেন। এই নিন্দা জানানোর বিষয়টি প্রমাণ করে যে, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কোনো বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নয়। বরং এর মাধ্যমে জাগ্রত হয় মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। আমরা লক্ষ করে দেখব প্রতিশোধমূলক মতবাদ শুধু প্রতিহিংসাকে সামনে নিয়ে আসে তা নয়, বরং দৃষ্টিকোণগত দিক থেকেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ঝুনো ও রাব্বির মধ্যকার একটি সংলাপ কল্পনার মাধ্যমে আমরা উক্ত সীমাবদ্ধতাটি বোঝে নিতে পারি :

প্রথমত. ঝুনো অসম্ভবরকম এজন ভালো মানুষ। বিশেষ কোনো বাস্তবতায় সে 'চ' নামক কাজ করেছে। 'ঝুনো' এরকম একটি কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ হয়তো ভাবতে পারে 'ক্রিয়া-চ' ন্যায্যতার দাবি রাখে। কারণ 'ঝুনো' হলেন একজন ভালো মানুষ, যিনি ভালো তিনি ভালো কাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, দেখা গেল ক্রিয়া 'চ' একটি মন্দ কাজ, একাজটি করার ফলে 'মিজু' নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঝুনোর কাজ যদি কারো মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে ভালো মানুষ নয়। একারণে বলা যায়-'ঝুনো' সম্পর্কে পূর্বে যে মন্তব্য করেছেন তা মিথ্যায় পর্যবসিত হলো। যদি এরকম হয় যে, ঝুনো ঐ কাজটি করতে কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়েছেন। প্রশ্ন হলো এরকম বাস্তবতায় ঝুনোকে কীভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে? প্রতিশোধমূলক মতবাদ যখন ঝুনোকে শাস্তি প্রদানের বিবেচনায় আনবে সেই বিবেচনায় সে ভালো কি মন্দ তা গুরুত্ব পাবে না। গুরুত্ব পাবে অপরাধের স্বনিহিত মূল্যটি। দ্বিতীয়ত. উল্লিখিত ঘটনাটির দ্বিতীয় বিবেচনাটিকে দুটি দিক থেকে দেখতে পারি :

১. উপর্যুক্ত ঘটনায় বিচারক ও অপরাধী উভয়েরই অবস্থান খুবই সন্নিকটস্থ। কারণ যিনি শাস্তি দিচ্ছেন তিনিও হয়তো সম্মত হচ্ছেন " ঝুনো একজন ভালো মানুষ"। কিন্তু, ঝুনো যে কাজটি করেছে তা খুবই নিন্দনীয় ও মন্দ। এটি যুক্তিবিচারের একটি মাত্রা হতে পারে। এ বিবেচনাটি বিমূর্ত অর্থে "নৈতিক আইন" (moral law) অথবা "ঐশী আইনের" (divine law) বাইরে থেকে প্রযোজ্য হয়েছে বলা যেতে পারে। ঐ বিচারের বিবেচনাটি ব্যক্তিগত অবস্থানেরও একটি দিক হতে পারে। ধরা যাক, 'ছ'এর কর্মটি হতে পারে কোনো ব্যক্তির প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন। এই অমর্যাদা প্রদর্শনের বিষয়টি ইঙ্গিত করছে যে, ঐ ব্যক্তির মর্যাদা পাবার কোনো অবস্থা নেই। এখানে মনে করা হচ্ছে যে, ব্যক্তি 'রহিম' মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়, এজন্য তার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাহলে এপরিপ্রেক্ষিতে বিচারের স্বরূপটি কীরকম

ফেলতে পারে। অপরাধী হয়তো চিন্তা করতে পারেন তার অপরাধের মাত্রা কিরকম ছিল, অথবা যিনি তার অপরাধের শিকার হয়েছেন তার প্রতি অপরাধীর ভাবাবেগইবা কিরকম ছিল? এসবকিছু মিলিয়ে শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশোধমূলক মতবাদ একটি জটিল বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। এতে করে এ মতবাদের বাস্তবসম্মত প্রয়োগ সম্ভব হয়ে উঠে না।

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশোধমূলক মতবাদ অপরাধের সমান বা তুল্য শাস্তি প্রদান করাকে অপরাধীর জন্য কাম্য মনে করে থাকে। কিন্তু, শাস্তি প্রদানের এই ব্যবস্থাটা কী এতো সহজ? কিংবা এতোটা সরলীকরণ বা একমাত্রিকভাবে কী শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যাচাই করা যায়? কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য অনেকগুলো উপাদান বিবেচনায় রাখতে হয়। তন্মধ্যে অপরাধীর সমাজ, আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ধরন, রাজনৈতিক ও মূল্যবোধগত পরিস্থিতি এবিবেচনার মূখ্য বিবেচ্য। অন্যান্য বিবেচনার মধ্যে রয়েছে যে ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তার অপরাধপ্রবণতা ও মানসিক অবস্থাও বিবেচনায় রাখা উচিত। বৈচারিক প্রক্রিয়ায় এসব বিষয়াদির যথোপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণ, ঘটনা ও অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা খুবই জরুরি। আবার বিচারব্যবস্থায় যদি প্রতিশোধের মতো কোনো রীতি প্রচলিত থাকে, তাহলে দেখা যাবে গোটা বিচারব্যবস্থাই একটি হিংস্রাত্মক ব্যবস্থায় পরিণত হবে। এটাও ঠিক যে, বিচারব্যবস্থায় তুল্য শাস্তির মাধ্যমে প্রকৃত কোনো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এমনকী অপরাধ সমস্যারও বাস্তবভিত্তিক কোনো সমাধান সম্ভব নয়।

প্রতিশোধমূলক মতবাদের পক্ষে হয়তো একটি জোরালো দাবি হতে পারে হত্যার বদলে হত্যা কিংবা জীবনের বদলে জীবন, অথবা দাঁতের বদলে দাঁত ইত্যাদি। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিশোধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়ে থাকে। স্যার জন স্যামণ্ডও স্বীকার করেন, অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদান প্রকৃতার্থে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্রোধ-সঞ্জাত আবেগ ও প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এরকম প্রতিশোধপরায়ণতার ফলে সমাজের বৃহত্তর কোনো বৌদ্ধিক উপলব্ধি এখানে আমরা লক্ষ করতে পারি না। সুতরাং, প্রতিশোধমূলক মতবাদে প্রতিফলিত হয় ক্রোধের মতো আবেগ ও প্রতিশোধ প্রবৃত্তি। এজন্য স্যামণ্ড বলেন, ক্রোধের মতো আবেগ যা ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে গ্রাস করে সেধরনের আবেগ ও প্রতিশোধ প্রবৃত্তি সামাজিক ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। যেকোনো বিচার প্রক্রিয়া একদিকে যেমন ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীকে গুরুত্ব দেবে, অন্যদিকে মানবকল্যাণকেও পাশ কেটে যাবে না। আর যে বিচারব্যবস্থার মূললক্ষ্য হলো সামষ্টিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সেখানে প্রতিশোধ, কিংবা প্রতিহিংসা অথবা ক্রোধের মতো আবেগ গুরুত্ব পেতে পারে না। আধুনিক বিচারব্যবস্থায় মানবসভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির ধারায় মানবাধিকার ও মানব মর্যাদার ধারণার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিচারব্যবস্থায় আমূল সংস্কার সাধন করা উচিত। ক্রোধ, প্রতিহিংসা কিংবা আবেগের উপর নির্ভর করে প্রকৃত সভ্য সমাজ টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। একারণেই স্যামণ্ডের মতো অনেকেই মৃত্যুদণ্ডকে বিচারবিভাগীয়

হত্যাকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এবিবেচনায় প্রতিশোধমূলক মতবাদকে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। এরকম পুনর্বিবেচনায় আমরা কয়েকটি বিষয় সামনে রাখতে পারি :

প্রথমত, প্রতিশোধ কি কড়ায় গণ্ডায় শোধ (lex talionis) করা যায় "চোখের বদলে চোখ" কিংবা অন্যকোনো সমতূল্য প্রতিবিধান থাকা কি প্রতিশোধের মূলভিত্তি? পৃথিবীর নগন্যসংখ্যক জনগোষ্ঠী হয়তো এরকম বিধান অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু প্রায়োগিক অর্থে তা সকলসময় সকল সমাজের পক্ষে সংগতিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অনেকসময় এধরনের আইন প্রয়োগের ফলে অপরাধীর সময়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জীবন ও অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। অথচ অপরাধের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় লক্ষ করা যেত অপরাধীর অপরাধ পরিপূর্ণ বিবেচনা না করে তাদের উপর দুঃখজনক ক্লেশ ও অপমান করা হতো। যেকোনো বাস্তবতায় যদি "চোখের বদলে চোখ" নীতিকে আদর্শিকভাবে আরোপ করতে হয় তাহলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি প্রস্থুতির প্রয়োজন হয়। এ প্রস্থুতি একদিকে রসদ সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে নৈতিক প্রস্থুতিরও প্রয়োজন হয়। এসবকিছু মিলিয়ে বলা যায়-পরিণতিতে প্রতিশোধমূলক মতবাদ একধরনের দীর্ঘসূত্রিতা। তবে কল্যাণ ও বিরতির অর্থে এ মতবাদকে প্রতিহিংসাজাত বলা যায় না। এর অর্থ হলো : প্রতিশোধমূলক মতবাদ পরিপূর্ণ অর্থে প্রতিশোধমূলক নয়।

দ্বিতীয়ত, অনেকসময় দাবি করা হয় যে, পরিচিত বা চেনাজানা কোনো অপরাধীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা অথবা জঘন্য অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তোলা এ মতবাদের লক্ষ্য নয়। আবার প্রতিশোধ মানেই এই নয় যে, রাষ্ট্র বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে কারো প্রতি শোধ নিবে, প্রতিহিংসা বাস্তবায়ন করবে। প্রতিশোধ নেওয়া কখনোই রাগ-বিদ্বেষ, ঘৃণা অথবা অন্যকোনো ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হলে হবে না। কিংবা কোনো গোষ্ঠী আরোপিত অত্যাচার ও অপমান হলেও হবে না। অধিকাংশ সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ তেমন কোনো পাশবিকতা কিংবা নিপীড়ণ বিস্তার নাও করতে পারে। সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকেও অপরাধের সৃষ্টি হতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা প্রায়সময়ই আমাদেরকে সহ্য করতে হয়, এমনকী তা ব্যক্ত করা যায় না। সুতরাং, এসব বিবেচনার ক্ষেত্রে অপরাধের কোনো তুল্য শোধ নেই।

তৃতীয়ত, অপরাধীর যন্ত্রণার যে 'অন্তর্নিহিত মূল্য' (intrinsic value) তা নিবারণের জন্য যৎসামান্য করার সুযোগ রয়েছে। এরকম অভিমত আমরা লক্ষ করি এইচ. এল. হার্ট এর বক্তব্যে। তিনি দাবি করছেন, যন্ত্রণারই কেবল 'অন্তর্নিহিত মূল্য' রয়েছে, যদিও এর বিশেষ কিছু সমস্যা রয়েছে। নিপীড়ণ, ক্ষতি, জটিলতা ও যা কিছু স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত যন্ত্রণা তা থেকে আলাদা কিছু নয়। যন্ত্রণাকে অনেকসময়ই মন্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

---

24 Salmond, Sir John. 1913. Jurisprudence, Digital Library, Stevens and Haynes, 4th Edition, London, Digital version has got from Cornell University, USA, p.118.

আর যা কিছু মন্দ নিশ্চয়ই তার কোনো 'অন্তর্নিহিত মূল্য' থাকতে পারে না। এখন আমরা যদি হার্টের বিবেচনাকে গ্রহণ করি তাহলে বুঝতে হবে যে, অপরাধের তুল্যবিচার হিসেবে শাস্তি প্রদান একটি অন্যায্য প্রতিদান। এদিক থেকে আমাদের ধরে নিতে হবে যন্ত্রণা নিজের দিক থেকে একটি 'করণিক মূল্য' (instrumental value), কোনোভাবেই বলা যাবে না যে, এর 'অন্তর্নিহিত মূল্য' রয়েছে। অন্তর্নিহিত মূল্য কখনোই শাস্তিকে অনুমোদন করে না।

চতুর্থত, প্রতিশোধ কখনোই বিচার প্রক্রিয়ার বিধি হতে পারে না। এটি নির্ভেজাল শাস্তি সম্পর্কিত একটি মতবাদ। এখানে মনে রাখার বিষয় হলো যে, অপরাধ বিষয়ক আইনের কাঠামো গঠিত রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে, সমাজের সাধারণ কল্যাণকে কেন্দ্র করে। এই একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। অর্থাৎ কাউকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যা করা যাবে না। কিংবা শারীরিকভাবে কোনো ক্ষতি করা যাবে না ইত্যাদি।

পাঁচ

শাস্তি : প্রতিশোধ নাকি প্রতিরোধ?

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি শাস্তির ধরন হিসেবে প্রতিশোধ উৎকৃষ্ট কোনো মাধ্যম নয়। আইনীয় ও বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিশোধ চূড়ান্ত কোনো লক্ষ্য হতে পারে না। আমরা সকলসময় সমাজ থেকে অপরাধ দূর করতে চাই। কখনোই আমরা অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হতে চাই না। তাহলে বিকল্প হিসেবে কিধরনের মতবাদকে গ্রহণ করব? সেটি কি প্রতিরোধ মতবাদ (theory of deterrence)? প্রসঙ্গক্রমে জেনে নিতে পারি প্রতিরোধ মতবাদ কী? বিশেষ যৌক্তিকতা নিয়ে বিকাশ ঘটেছে প্রতিরোধ (deterrence) মতবাদের। এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো : অপরাধ প্রতিরোধ করাই শাস্তির লক্ষ্য। যারা অপরাধী কিংবা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অপরাধী তাদেরকে এ মতবাদ সতর্ক করিয়ে দেয় যে, তারা যেন পৌনঃপুনিক অপরাধ সংঘটন না করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজে অপরাধ আছে, আবার সংহতিও রয়েছে। মানুষের কাঙ্খিত লক্ষ্য হলো সংহতি অর্জন করা। কিন্তু অপরাধী তা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। এ বাধা একদিকে যেমন সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য প্রতিবন্ধকতা, অন্যদিকে তা সামাজিক প্রগতিকেও রুখে দেয়। সমাজ বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রতিবন্ধকতা আরো দৃঢ় ছিলো। সেসময় সমাজে ন্যায়বিচার বলে কিছু ছিল না। সমাজ ছিল বিশৃঙ্খল, দুর্নীতিগ্রস্থ। একটা সময় ছিলো যখন প্রায় সরকার ব্যবস্থাই ছিল স্বেচ্ছাচারি, রাজতান্ত্রিক, একইসঙ্গে সবল একনায়কতান্ত্রিক। এরকম বাস্তবতায় মানুষের প্রয়োজনেই ন্যায়পরতার দাবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা আইনীয় ব্যবস্থার অধীনে আসবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। আইনীয় ব্যবস্থার লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ। সুতরাং, সেই কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন কল্যাণের বিঘ্ন কোনোকিছুকে প্রতিরোধ করা।

---

25 Hart, H.L.A., 1982. "Prolegomenon to the Principles of Punishment", in Punishment and Responsibility, 1, 8, 5th edit.

প্রতিরোধবাদীগণ শাস্তি বলতে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসাকে বোঝায়নি। তাদের লক্ষ্য হলো যেকোনো বিচারের রায় বা শাস্তির বিধানকে সুনির্দিষ্ট করা। অপরাধী যে মাত্রায় অপরাধ করবে ঠিক সেই মাত্রায় তার শাস্তি দিতে হবে। আর যেটুকু শাস্তি প্রযোজ্য তার থেকে অধিকতর কিংবা জটিল কোনো শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ন্যায়বিচার হলো আরেকটি দাবি। কারণ জনগণ যদি বুঝতে পারে প্রযোজ্য শাস্তিটি ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়নি তখন স্বাভাবিক কারণে জনগণ এর বিরোধীতা করবে। এ বিরোধীতা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। সুতরাং, সমাজকে সংহত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ রাখার জন্য অপরাধ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। প্রতিরোধ মতাদর্শীদের ইতিবাচক দিক হলো তারা প্রথমেই মানুষকে দায়িত্বশীল ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। বুদ্ধিজীবী মানুষ যদি বুঝতে পারে যেকোনো অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান খুবই দ্রুত ও ত্বরিত, পাশাপাশি তা সুনির্দিষ্ট, ন্যায্য, পর্যাপ্ত অর্থে কঠিন ও কঠোর তাহলে সে কখনোই অপরাধ করবে না। সমাজের যেকোনো ব্যক্তিই তা অমান্য করা অপেক্ষা মান্য করতে প্রস্তুত থাকবে। প্রতিরোধ মতবাদের এ দাবির কারণে বলা হয়—যদি আইনীয়ভাবে একটি আতঙ্ক বা ধমক ব্যক্তির সামনে জারি থাকে তাহলে তা অপরাধীর আচরণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি মানুষ হলো বুদ্ধিজীবী প্রাণী। একারণে সে বোঝে অন্যায় আচরণ করে সে ভালো কোনো সুবিধা অর্জন করতে পারবে না। আর যদি তাদের সামনে কোনো শাস্তির ভয় থাকে তাহলে তারা ভয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে। সবমিলিয়ে বলা যায়-অপরাধ ও এর শাস্তি বিধানের নিশ্চয়তার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্ক অপরাধীকে সতর্ক রাখবে, কার্যত তাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখবে। অপরাধীর প্রতি প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ অপরাধ দমনে কোনো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে না। এজন্য অপরাধ দমন অপেক্ষা প্রতিরোধের ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট।

অপরাধ নির্মূলে তাই প্রতিশোধ অপেক্ষা প্রতিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। অনেকটা চিকিৎসা গ্রহণ অপেক্ষা রোগবালাই প্রতিরোধ করা যেমন শ্রেয়, তেমনি অপরাধ দমন করা অপেক্ষা অপরাধীদের অপরাধ করতে না দেওয়াই শ্রেয়। বেকারিয়ার দর্শনের প্রভাবেই মনে করা হয়-অপরাধীর কয়েদখানা যেন নিরাপদ হয়, অপরাধীর প্রতি যেন মানবীয় মনোভাব প্রদর্শন করা হয়। আর শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন ধনী ও দরিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য না থাকে। আইনের স্বরূপ অপেক্ষা বিচারক নিজেই বুঝার চেষ্টা করবেন অপরাধের প্রকৃতি কি, অপরাধীর মনোভাব ও উদ্দেশ্য কি। আইনবিদ অবশ্যই আইনের অনুশীলন করবেন ও অপরাধের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও চরিত্র বোঝার চেষ্টা করবেন। প্রতিটি অপরাধের জন্য আলাদা আলাদা করে বিচারকার্য থাকবে। প্রতিরোধের মূল্যকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি অপরাধের সমতুল্য শাস্তির প্রস্তাব করবেন। যে পরিমাণ ও মাত্রায় অপরাধ হবে ঠিক সেই অনুপাতে শাস্তি প্রদান করবেন, এর অধিক নয়। আর কোনো অপরাধের মাত্রা ও তীব্রতা নির্ধারিত হবে সংঘটিত অপরাধের ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রের কতোটা ক্ষতি সাধিত হলো তার উপর ভিত্তি করে।

প্রতিশোধমূলক মতবাদের মতো প্রতিরোধ মতবাদও সকল সময় ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিরোধ মতবাদের প্রথম বিবেচনা হলো অপরাধ নির্মূলে প্রতিরোধ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। নানা কারণে প্রতিরোধমূলক মতবাদকেও প্রত্যাখ্যাণ করা যায়, হেগেল তাঁর *Philosophy of Rights* গ্রন্থে প্রতিরোধ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে: এক. এই মতবাদ অপরাধী ও ভবিষ্যতের অপরাধী উভয়কে ভয় দেখিয়ে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে চান। এই ভয় দেখানোর মধ্য দিয়ে মূলত ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হেয় ও তুচ্ছ করা হয়ে থাকে। ভয় ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি তিনি আরো স্পষ্ট করেছেন কুকুর ও মনিবের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। একজন মনিব তার গৃহপালিত কুকুরকে পোষ মানানোর জন্য, নানাকিছু থেকে বিরত রাখার জন্য বেত ব্যবহার করে থাকেন। কুকুরের নানাধরনের কাজ, কুকুরের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেতের ভয় সারাক্ষণ বহাল রাখতে হয়। বেতের ভয়ে কুকুরের স্বাভাবিক চলাফেরা, গতিবিধি ও প্রাকৃতিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ব্যহত হয় কুকুরের স্বাভাবিক জীবন ও স্বাধীনতা। প্রতিরোধ মতবাদে শাস্তির ভয় অনেকটা কুকুরের উপর মনিবের ছড়ি ঘুরানোর মতোই। এই ভয় একদিকে যেমন মনস্তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতাকেও খর্ব করে থাকে। ভয় ও খর্ব স্বাধীনতা উভয়ই ব্যক্তি মর্যাদার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তুচ্ছ করে, আর শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরাধ কমিয়ে সামাজিক মঙ্গল বাস্তবায়ন করা কঠিন কাজ।

প্রতিরোধ মতবাদ সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো: এ মতবাদ কী ব্যক্তি মর্যাদাকে সমুন্নত করতে সক্ষম? অপরাধী চিহ্নিত করে অপরাধের তুল্যবিচার হিসেবে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয় সমাজের সম্ভাব্য অপরাধীকে হুশিয়ার করার জন্য। শাস্তি যিনি পাচ্ছেন তার মর্যাদা, আর সম্ভাব্য ব্যক্তির মর্যাদা উভয়কে এখানে গৌণ করে দেখা হয়েছে।

প্রতিরোধ মতবাদের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ লক্ষ্য করা যায় জেফরি মারফির দ্বিতীয়টি ডার্কের আলোচনায়।

জেফরি মারফি বলছেন, প্রতিরোধের লক্ষ্য হলো সমাজের অন্যান্য অপরাধীকে খবরদারী করা। এই খবরদারীর অর্থ হলো তারা যেন কোনো অপরাধ না করে। এখানে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে। স্পষ্টতই অপরাধীকে ব্যবহার করা হচ্ছে অপরাধ হ্রাসকরণের মাধ্যম হিসেবে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য সামাজিক মুনাফা লাভের মাধ্যমও। প্রতিরোধ মতবাদের বিরুদ্ধে আরেকটি জোরালো আপত্তি উত্থাপন করেছেন আর এ ডার্ফ। তিনি বলছেন, যেকোনো আপরাধ আইন (criminal laww) ও শাস্তির লক্ষ্য হলো অপরাধ প্রতিরোধ করা। এখানে ডার্ফ দাবি করছেন, মানুষ সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার সূত্রধরেই সে

---

26 Beccaria, C. 1995. On Crimes and Punishments, R Bellamy (ed), p.113.
27 Murphy, Jeffrie G., 1973. Marxism and Retribution, 2 PHIL. & PUB. AFF. 217, 218-19.

নৈতিক কর্তা (moral agents)। এই নৈতিক কর্তা অন্য কারো লক্ষ্য অর্জনের উপায় নয়। লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করার অর্থই হলো তার নৈতিক কর্তার শর্তটিকে অস্বীকার করা। শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিরোধ মতবাদে অপরাধীকে নৈতিক কর্তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই বাদ দেবার অন্য কথা হলো তাকে রাজনৈতিক সম্প্রদায় থেকে বাদ দেয়া। সুতরাং, মারফির বিবেচনায় প্রতিরোধ মতবাদ রাজনৈতিক মত ও পথের পরিপন্থি। প্রশ্ন হতে পারে মারফির দাবির যৌক্তিকতা কতোটুকু? এ প্রশ্নের উত্তরে আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপন করতে পারি। অপরাধের কারণে ব্যক্তির শাস্তি পাবার অর্থ হলো তাকে মনে করিয়ে দেয়া যে, সেও নৈতিক কর্তা। নৈতিক কর্তা হয়েও সে নিয়মে কাজ না করার ফলে তাকেই শাস্তি পেতে হয়েছে। অপরাধ করার অর্থই হলো অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, কিংবা অন্যের জীবন বিপন্ন করার কারণ হওয়া। এই কারণ মূলত একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে অন্য নৈতিক কর্তার মর্যাদাকে আঘাত করা। কিন্তু এটাও সত্য যে, নৈতিক কর্তা কখনোই অন্যের নৈতিক মর্যাদাকে আঘাত করতে পারেন না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, শাস্তি হিসেবে প্রতিশোধ কিংবা প্রতিরোধ কোনোটিই মানব মর্যাদা ও যৌক্তিক ন্যায়বিচারকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। তাহলে শাস্তি ধারণাটিকে কোন অর্থে গ্রহণ করব? শাস্তি নাকি সংশোধন? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে গ্রহণ করতে পারি। একই সমাজে বিভিন্ন মানুষজন বেড়ে উঠে, সবাই যদি অপরাধী হতো তাহলে সমাজ টিকে থাকতো না। কিন্তু সমাজের অনেকের মধ্যে কেউ কেউ অপরাধী হয়ে ওঠে। তারা নানাভাবে সমাজের ক্ষতি করে থাকে। প্রশ্ন হলো অসংখ্য মানুষের মধ্যে কেউ কেউ কেন অপরাধী হয়? এক্ষেত্রে আমরা দুটি যুক্তি উপস্থাপন করতে পারি। প্রথমেই বলা যায়, মানুষ জন্মগতভাবে ভালো। কিন্তু সমাজ তাকে কলুষিত করে। সামাজিক জীবনের পাপ, অবিচার তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে। সুতরাং কারো অপরাধী হবার পেছনে সমাজ দায়ী। অপরাধী হবার জন্য সমাজ যদি দায়ী হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনবার জন্য সমাজকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশ্ন হলো অপরাধীকে সারিয়ে তোলবার জন্য সমাজের দায়িত্বটি কিধরনের হবে? খুব মামুলিভাবে বলা যায়-অবশ্যই দায়িত্বশীল কিছু হতে হবে। দায়িত্বশীলতার মধ্যে একটি হলো ঐ অপরাধীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সাপোর্ট দিয়ে তার মধ্যে অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি করা। পাশাপাশি তার আচরণে ব্যাপক সংশোধনও করা। আত্মসমালোচনা করার সাহস তার কৃতকর্মকে প্রশ্ন করবার সুযোগ দিবে। নিজেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমেই সম্ভব নিজের মধ্যকার পাপসমূহ মুছে ফেলা। সংশোধনবাদী মতবাদ মূলত প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ তত্ত্বের সমালোচনায় মুখর। শাস্তির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা উত্থাপন করে থাকে সংশোধনবাদীগণ। তারা মনে করেন, শাস্তির অর্থই হলো কাউকে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন করা। কেউ অপরাধ করেছে, হতে পারে এই অপরাধ কারো শারীরিক ও মানসিক পীড়নের কারণও। কিন্তু তাই বলে কি ঐ ব্যক্তিকে একই শাস্তি দিতে হবে। এতে করে শাস্তির ধারাবাহিকতাই বাড়বে। বাড়বে পীড়নের পরিমাণ। পীড়ণ বাড়িয়ে শাস্তিকে কার্যকর করা যায় না। তাহলে আমরা শাস্তির মাধ্যম হিসেবে প্রতিশোধ কিংবা প্রতিকারকে গ্রহণ না করে সংশোধনকে বিবেচনা করতে পারি।

নৈতিক কর্তা (moral agents)। এই নৈতিক কর্তা অন্য কারো লক্ষ্য অর্জনের উপায় নয়। লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করার অর্থই হলো তার নৈতিক কর্তার শর্তটিকে অস্বীকার করা। শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিরোধ মতবাদে অপরাধীকে নৈতিক কর্তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই বাদ দেবার অন্য কথা হলো তাকে রাজনৈতিক সম্প্রদায় থেকে বাদ দেয়া। সুতরাং, মারফির বিবেচনায় প্রতিরোধ মতবাদ রাজনৈতিক মত ও পথের পরিপন্থি। প্রশ্ন হতে পারে মারফির দাবির যৌক্তিকতা কতোটুকু? এ প্রশ্নের উত্তরে আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপন করতে পারি। অপরাধের কারণে ব্যক্তির শাস্তি পাবার অর্থ হলো তাকে মনে করিয়ে দেয়া যে, সেও নৈতিক কর্তা। নৈতিক কর্তা হয়েও সে নিয়মে কাজ না করার ফলে তাকেই শাস্তি পেতে হয়েছে। অপরাধ করার অর্থই হলো অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, কিংবা অন্যের জীবন বিপন্ন করার কারণ হওয়া। এই কারণ মূলত একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে অন্য নৈতিক কর্তার মর্যাদাকে আঘাত করা। কিন্তু এটাও সত্য যে, নৈতিক কর্তা কখনোই অন্যের নৈতিক মর্যাদাকে আঘাত করতে পারেন না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, শাস্তি হিসেবে প্রতিশোধ কিংবা প্রতিরোধ কোনোটিই মানব মর্যাদা ও যৌক্তিক ন্যায়বিচারকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। তাহলে শাস্তি ধারণাটিকে কোন অর্থে গ্রহণ করব? শাস্তি নাকি সংশোধন? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে গ্রহণ করতে পারি। একই সমাজে বিভিন্ন মানুষজন বেড়ে উঠে, সবাই যদি অপরাধী হতো তাহলে সমাজ টিকে থাকতো না। কিন্তু সমাজের অনেকের মধ্যে কেউ কেউ অপরাধী হয়ে ওঠে। তারা নানাভাবে সমাজের ক্ষতি করে থাকে। প্রশ্ন হলো অসংখ্য মানুষের মধ্যে কেউ কেউ কেন অপরাধী হয়? এক্ষেত্রে আমরা দুটি যুক্তি উপস্থাপন করতে পারি। প্রথমেই বলা যায়, মানুষ জন্মগতভাবে ভালো। কিন্তু সমাজ তাকে কলুষিত করে। সামাজিক জীবনের পাপ, অবিচার তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে। সুতরাং কারো অপরাধী হবার পেছনে সমাজ দায়ী। অপরাধী হবার জন্য সমাজ যদি দায়ী হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনবার জন্য সমাজকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশ্ন হলো অপরাধীকে সারিয়ে তোলবার জন্য সমাজের দায়িত্বটি কিধরনের হবে? খুব মামুলিভাবে বলা যায়-অবশ্যই দায়িত্বশীল কিছু হতে হবে। দায়িত্বশীলতার মধ্যে একটি হলো ঐ অপরাধীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সাপোর্ট দিয়ে তার মধ্যে অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি করা। পাশাপাশি তার আচরণে ব্যাপক সংশোধনও করা। আত্মসমালোচনা করার সাহস তার কৃতকর্মকে প্রশ্ন করবার সুযোগ দিবে। নিজেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমেই সম্ভব নিজের মধ্যকার পাপসমূহ মুছে ফেলা। সংশোধনবাদী মতবাদ মূলত প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ তত্ত্বের সমালোচনায় মুখর। শাস্তির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা উত্থাপন করে থাকে সংশোধনবাদীগণ। তারা মনে করেন, শাস্তির অর্থই হলো কাউকে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন করা। কেউ অপরাধ করেছে, হতে পারে এই অপরাধ কারো শারীরিক ও মানসিক পীড়নের কারণও। কিন্তু তাই বলে কি ঐ ব্যক্তিকে একই শাস্তি দিতে হবে। এতে করে শাস্তির ধারাবাহিকতাই বাড়বে। বাড়বে পীড়নের পরিমাণ। পীড়ণ বাড়িয়ে শাস্তিকে কার্যকর করা যায় না। তাহলে আমরা শাস্তির মাধ্যম হিসেবে প্রতিশোধ কিংবা প্রতিকারকে গ্রহণ না করে সংশোধনকে বিবেচনা করতে পারি।

শাস্তি নয়, সংশোধন হতে পারে বিচারের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সংশোধনবাদের এরকম দাবির বিরুদ্ধেও কিছু আপত্তি উত্থাপন করা যায়। তার মধ্যে একটি আপত্তি হলো যে, এ মতবাদ বৈশিষ্ট্যগত থেকে আদর্শবাদী। আদর্শবাদী হবার ফলে এর মধ্যে বাস্তবতা অপেক্ষা আবেগীয় বা কল্পনার প্রাধান্য থেকে যায়। যেমন, অনেক অপরাধী রয়েছে প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সামাজিক বৈভব অর্জনের জন্য অপরাধকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় শক্তি-বলকেও এ কাজে ব্যবহার করে থাকে। যেমন, চোরাকারবারী, মাদকপাচারকারী, সন্ত্রাসী তাদের কাছে আচরণ সংশোধনের প্রস্তাব হাস্যকর। এরকম বাস্তবতায় অপরাধ কমানোর জন্য কি করা উচিত? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়-কঠোর শাস্তির মাধ্যমে কেবল তা প্রতিহত করা যায়। কঠোর নীতি একদিকে যেমন অপরাধীর অব্যাহত অপরাধ কর্মকে প্রতিহত করতে সমর্থ হবে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের কোনো অপরাধী যেন এধরনের অপরাধ করতে না পারে তার সতর্কবার্তা হিসেবেও ভূমিকা রাখবে। সুতরাং, শাস্তি হিসেবে প্রতিরোধাত্মক অবস্থানের কোনো বিকল্প কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু, শাস্তি হিসেবে আচরণের সংশোধন স্বরূপের দিক থেকে অনেক আশাবাদী মতাদর্শ হলেও, কার্যত এর ফলাফল খুবই হতাশাজনক হতে পারে। অপরাধী বণিতা করতে পারে যে, তার আচরণ শুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সে খুবই আত্মসচেতন, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ অপরাধসমূহ পুনঃপুন করেই যেতে পারে।

ছয়

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে পারি : প্রথমত, শাস্তির লক্ষ্য হলো অপরাধীর মধ্যে নৈতিক বিবেচনাকে পুনঃজাগরুক করা, দ্বিতীয়ত, শাস্তির অর্থ হলো অপরাধীকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে পুনর্বাসন করা, তৃতীয়ত, শাস্তি অনেকটা থেরাপিউটিক। এবিবেচনায় অপরাধকে মানসিক অসুস্থ হিসবে বিবেচনা করা হয়, মানসিক এই অসুস্থতাকে সারিয়ে সুস্থ করে তোলাই শাস্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে শাস্তি হিসেবে প্রতিকার, কিংবা প্রতিশোধকে প্রত্যাখ্যান করাই শ্রেয়। পাশাপাশি আমরা অন্যদেরকেও বিশ্বাস করাতে চাই যে, আমরা অপরাধীকে সারিয়ে তুলতে চাই। কিন্তু, শাস্তির নামে তাদেরকে হত্যা করা, বা দীর্ঘদিন আটকিয়ে রাখা লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এদিক থেকে আমরা প্রতিরোধাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারি। প্রতিরোধাত্মক মতবাদ দাবি করে যে, অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত। শাস্তি তার অপরাধপ্রবণ ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়কে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে সে নতুন করে কোনো অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, নিবৃত্ত থাকবে। এমনকী অপরাধীকে তার অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখার ফলে সে তার নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেকসময় তাকে শারীরকিভাবেও অক্ষম করে তোলা হবে। সর্বোপরি অভিপ্রায়কে বাধাগ্রস্ত করা, নতুন কোনো অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য অপরাধীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয় করাকে এমত সমর্থন করে। কিন্তু, সংশোধন মতবাদ প্রতিরোধাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে।

কারণ প্রতিরোধ অপরাধীর আচরণে ব্যাপক কোনো প্রভাব ফেলে না, এমনকী আত্মশুদ্ধি অপেক্ষা সমাজের প্রতি তাকে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করে তুলে। এসব কারণে সংশোধনবাদ মনে করে, আচরণের সংস্কার বা সংশোধন হওয়া উচিত শাস্তির মূললক্ষ্য। অপরাধীকে অপরাধপ্রবণ মানসিকতা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব জাগাতে হবে। সমাজের মূলধারার প্রতি তাকে আশাবাদী করে তুলতে হবে। এই আশাবাদী মনোভাবই পারবে তাকে দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য শুদ্ধ আচরণের অধিকারী করে তুলতে।

শাস্তি তা প্রতিশোধমূলক বা প্রতিরোধমূলক যাই হোক না কেন সকলসময় এর কিছু সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাসমূহ একদিকে যেমন সামাজিক সংকটকে ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তির মধ্যে, সমাজ জীবনে ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। শাস্তির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটি প্রথম বিবেচনায় আমরা শাস্তির অর্থদণ্ড ও অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক গঠন নিয়ে কথা বলতে পারি। কারণ শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, কখনোবা অপরাধীকে ভুলভাবে বিচার করা হয়। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা জীবন যাপনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড অনুসারে দিনাতিপাত করতে সক্ষম। অথচ আরো অধিক অর্থের লোভে তিনি আয়কর ফাঁকি দিচ্ছেন, শুল্ক ফাঁকি দেবার কৌশল অবলম্বন করছেন। উক্ত ব্যক্তি সবই করছেন অধিকতর মুনাফা লাভের জন্য। এটিও রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘনের একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে দেখা যাবে সে, গোটা বিচারপ্রক্রিয়াটি অসফল হয়ে যাবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যাক। অর্থনৈতিক অসৎ তৎপরতার সঙ্গে যদি কেউ জড়িত থাকে আর তুল্যবিচার হিসেবে তার দণ্ড হয় অর্থদণ্ড তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়ায়? এমনও হতে পারে তাকে ফাঁকি দেওয়া অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড দেওয়া হলো। ব্যক্তি দণ্ডবিধি অনুসারে উক্ত অর্থ রাষ্ট্রকে ফেরত দিলেন। কিন্তু এটা কি ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের কর ও শুল্ক ফাঁকি থেকে বিরত রাখার কোনো নিশ্চয়তা দেয়? রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে ব্যক্তি যদি মুনাফা অর্জন করতে পারে তাহলে কেন সে অপরাধ থেকে বিরত থাকবে? আবার অপরাধতো একধরনের মানসিক প্রবণতাও। যার প্রবণতা যেন-তেনভাবে অর্থ উর্পাজন করা তিনি কেন তা করা থেকে বিরত থাকবেন? প্রশ্ন হলো যার মানসিক প্রবণতাই অপরাধ করা তাকে কী সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো শাস্তির মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব? নিঃসন্দেহে অপরাধ মনোবিজ্ঞানীরা 'না' বলবেন। যুক্তি হিসেবে তারা বলবেন যে, যাদের আচরণ ব্যক্তির মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাদেরকে শাস্তি দিয়ে অপরাধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। বরং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সংশোধন, বা কাউন্সিলিং দ্বারা হয়তো ঐ অপরাধীর মধ্যে চূড়ান্ত সংশোধন আনা সম্ভব।

উপর্যুক্ত দুটি দিকই শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ডের অকার্যকরিকতা প্রমাণ করে। শাস্তির বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ দাঁড় করানো সম্ভব। শাস্তি হিসেবে অনেকসময় অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সৌদি আরবে এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় প্রকাশ্যে। মৃত্যুর এই ভয়ংকর দৃশ্য জনমনে ভীতির উদ্রেক করে। এই ভীতি সমাজদেহে সংক্রমিত হবার ফলে জনমনে আশাহীনতার সৃষ্টি হয়। এই ভয় জনগণের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততায়

বিঘ্ন ঘটায়। শাস্তির ভয় সমাজ দেহে সংক্রমণের মতো কাজ করে। এই সংক্রমণ মানসিকভাবে সাবলীল জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টির অন্তরায়। শাস্তির মাধ্যম হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে মানবাধিকারপন্থিগণ অভিযোগ করে আসছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা যে অবস্থান নিচ্ছেন তা মানব মর্যাদার (human dignity) পরিপ্রেক্ষিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই আপত্তির মধ্যে অন্যতম হলো মৃত্যুদণ্ড মানব মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীকে যে ভয় দেখানো হয় তা তাকে পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্ত করতে পারে না।

শাস্তি হিসেবে মৃত্যু কেন অবমাননাকর? এ সম্পর্কে একটি সময়োচিত ব্যাখ্যা থাকা জরুরি। তবে ইমানুয়েল কান্টের বরাত দিয়ে বলা যায়-মৃত্যু মানবজাতির জন্য অবমাননাকর। অপরাধ দমনের নাম করে কারো জীবননাশ মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননাকে উস্কে দেয়। বিষয়টি সহজ করে বোঝে নিতে পারি : মৃত্যুদণ্ড কী? মৃত্যু হলো শারীরিকভাবে প্রাণসংহার করা। প্রাণসংহারকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের পূর্বে ব্যক্তির আচরণের আমূল সংশোধনের সর্বশেষ প্রচেষ্টাটিও বিবেচনায় থাকা উচিত। এই প্রচেষ্টা হয়তো মানুষের মধ্যে শুভ ও কল্যাণকর চিন্তা বয়ে আনতে পারে। রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হলো মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননা বৃদ্ধি না করে শুভ কল্যাণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিকভাবে কোনো অপরাধীকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়ে তার প্রাণসংহারের মাধ্যমে অপরাধ নির্মূল করার দাবি রাষ্ট্রের দায়িত্বে অবহেলার সামিল। আর মানুষ ও মনুষ্যত্বকে মাধ্যম (means) হিসেবে ব্যবহার করা মানুষকে অবমাননা করারই নামান্তর। ইমানুয়েল কান্টের শর্তহীন আদেশের দ্বিতীয় নীতি মানব মর্যাদাকে সমুন্নত করার কথা বলেছেন। এই নীতি মানুষের মর্যাদাকে যেমন সমুন্নত করার নির্দেশ দেয়, তেমনি মানুষ ও মানবতার বিপন্নতা রোধেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার পরামর্শ দেয়।

কান্ট ছাড়াও রাজনৈতিক দর্শনের অসংখ্য আদর্শ রয়েছে যা নাগরিক চেতনা ও রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর সোচ্চার হবার পরামর্শ করে। এসব মতাদর্শ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পক্ষে। প্রশ্ন হলো শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প কি হতে পারে? অথবা শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কি পরিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম? তা হলে এসব লক্ষ্যসমূহ কী? আপাতত একটি লক্ষ্য আমরা উল্লেখ করেছি, তা হলো : ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে সফল করে তোলা। প্রশ্ন হতে পারে ফৌজদারি ব্যবস্থা কি সমাজ থেকে অপরাধ দমনে সহায়ক হতে পারে? যেসব দেশে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রচলিত রয়েছে সেখানে কি অপরাধ একেবারে কমে গিয়েছে? প্রতিবছরই বৈচারিক কাজের অংশ হিসেবে অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করানোই নির্দেশ করে সেই রাষ্ট্রে অপরাধ কমে যায়নি। বরং সক্রিয় রয়েছে। অনেকসময় দেখা যায় মৃত্যুদণ্ড ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। মৃত্যদণ্ডের হার বৃদ্ধি অপরাধের যথোপযুক্ত প্রতিকার হচ্ছে সেই দাবি করে না। বরং এটি সেই রাষ্ট্রের অপরাধের হার বৃদ্ধির বিষয়টিকেই নির্দেশ করে থাকে। এজন্য বলা যায়-মৃত্যুদণ্ড সাধারণ প্রচলিত ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে সফল করতে পারে না। এই ব্যর্থতা মূলত শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শাস্তি হিসেবে যদি মৃত্যুদণ্ডও অপরাধ দমনে

ভূমিকা রাখতে না পারে তাহলে আমাদের কি করা উচিত? বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রের জন্য পালনীয় কয়েকটি কর্মসূচি প্রস্তাব করতে পারি :

১. অপরাধী যদি চোর বা দুর্বৃত্ত হয় তাহলে রাষ্ট্রের উচিত হবে তাকে কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখা। তাদের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই ব্যতিব্যস্ততার কারণে অপরাধী হয়তো অপরাধকর্মের দিকে ধাবিত নাও হতে পারে। অপরাধী যদি কর্মহীন হয় তাহলে রাষ্ট্রের উচিত হবে তাকে চূড়ান্ত শাস্তি না দিয়ে কোনো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় এনে উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহিত করা। এই উৎসাহের মাধ্যমে একসময় সে হয়তো বুঝতে পারবে তার অপরাধের কারণ ও এর অকার্যকারিতা সম্পর্কে।

২. অপরাধীর জন্য ইতিবাচক বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বিনোদন যেকোনো ধরনের হতে পারে। বিনোদনের পাশাপাশি আত্মসংশোধনের সুযোগ রাখতে হবে। এই সুযোগ সমাজ ও রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করতে হবে। একেকজন অপরাধী একেক কারণে অপরাধী হয়ে থাকে। এ কারণসমূহ যথাযথভাবে নির্ধারণের মাধ্যমেই সম্ভব যথাযথ আত্মসংশোধন সৃষ্টি করা। ধরা যাক, একজন ব্যক্তির প্রবণতা হলো নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে বালিয়ে অপরহরণ করে হত্যা করা। এই হত্যার মধ্য দিয়ে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে। আবার আরেকজন আছে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সংগ্রহ করার জন্য হত্যা করে থাকে। দুটিই হত্যাকাণ্ড। অথচ দুই হত্যাকাণ্ডের মোটিভও ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণেই তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধি বা সংশোধনের কৌশল খুঁজতে হবে।

৩. অপরাধীর আত্মোপলব্ধির সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ হয়তো তার মধ্যে অনুশোচনার সৃষ্টি করবে। এই অনুশোচনাই তাকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে। এজন্যই আমরা বলতে পারি : শাস্তি অপেক্ষা আত্মোপলব্ধি অর্জনে সহায়তা করাই হতে পারে অপরাধ নির্মুলের অন্যতম মাধ্যম।

একসময় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য শাস্তিকে অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আবার আইনীয় ও বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রও নাগরিকের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রেখে থাকে। কোনো নাগরিক যদি রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে তাহলে সেই আইনের প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থাটিই শাস্তি। রাসেল তাঁর *On Education* গ্রন্থে শাস্তি অধ্যায়ে শিক্ষা প্রদানে শাস্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অস্বীকৃতিটিকে প্রাসঙ্গিকভাবে নিয়ে আসছি একারণে যে, তিনি শাস্তিকে নেতিবাচক ক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। শাস্তি যেকোনো ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়ার ফল হলো ব্যক্তির মধ্যে হতাশা, বিষন্নতা আবার কখনোবা হীনমন্নতা সৃষ্টি করে।

উক্ত প্রবন্ধে আমরা লক্ষ করেছি শাস্তি হিসেবে প্রতিশোধ সকলসময়ই ভালো কোনো

ফলাফল দিতে পারে না। প্রতিশোধ শিক্ষণীয় কোনো মাধ্যমও নয়। যদিও প্রতিশোধ মতাদর্শিগণ কাকতাড়ুয়া সাদৃশ্যমান যুক্তির সাহায্যে দেখান, গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থায় পাখির ফসল নষ্ট করা থেকে বিরত রাখার জন্য কাকতাড়ুয়া কিংবা মৃত পাখি ঝুলিয়ে রাখা হয়। লক্ষ্য অন্য পাখি যেন ভয়ে পালিয়ে যায়। প্রাণিজগতের এই সাদৃশ্যনুমান মানুষের ক্ষেত্রে কতোটা প্রযোজ্য হতে পারে? হয়তো এ মতবাদের মতাদর্শিগণ ভাবতে পারেন যে, কাউকে যদি অপরাধের বদলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে এই শাস্তির ভয়ে ভবিষ্যতের অপরাধী অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কি তার প্রতিফলন দেখা যায়? আমরা স্ক্যান্ডেভিয়ান ইউরোপের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসতে পারি। সেখানে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ। আবার অপরাধের হার আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার চেয়ে অনেক অনেক অংশে কম। প্রশ্ন হলো শাস্তির প্রতিশোধ ব্যবস্থা না রেখেও তারা কিভাবে এ সাফল্য অর্জন করেছে? নিশ্চয়ই বিকল্প কোনো পন্থা তাদের ছিলো যেটা প্রতিশোধপরায়ণ নয়। সুতরাং প্রতিশোধের মতো ভয়ঙ্কর বিপদজনক উপায় অপেক্ষা শিক্ষণীয়, সহনীয় কোনো পন্থা অবলম্বন করে আমরা যদি ভালো ফল পাই তাহলে কেন জটিল পথে যাব? এ প্রশ্নটিই আমাদেরকে বলে দেয় শাস্তি হিসেবে প্রতিশোধ বা হিংস্রতার মতো কোনো উপায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একারণে বলা যায়- মানুষের মর্যাদা, নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ও সভ্যতার চূড়ান্ত মানদণ্ডে শাস্তির প্রতিশোধমূলক মতবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তথ্যনির্দেশিকা

Benn, S. I.1958. 'An Approach to the Problems of Punishment', Philosophy, Vol. XXXIII.

Bradley, F.H. 1988 (1876). **Ethical Studies,** Oxford: Clarendon Press.

Bradley, F.H., 1894. 'Some Remarks on Punishment', **International Journal of Ethics,** 4.

Brooks, Thom, 2011, "Is Bradley a Retributivist?" **History of Political Thought,** 32 (1)

Cavadino, Michael and Dignan, James, 2007. **The Penal System: An Introduction,** 4th edn, Sage Publications Limited , 44.

Cahill. Michael, 2007. **Retributive Justice in the Real World,** Washington University Law Review, 85.

Day, J.P. 1978. 'Retributive Punishment', **Mind,** 87.

Davis, M., 1986. 'Harm and Retribution', **Philosophy and Public Affairs,** 15

Hershenov, D.B., 1999. 'Restitution and Revenge', **Journal of Philosophy,** 96 (1999), pp. 80–1;

Hershenov, D.B., 2000. 'Punishing Failed Attempts Less Severely Than Successes', **Journal of Value Inquiry,** 34, p. 482.

Hart, H. L. A. 1959-60. 'Prolegomenon to the Principles of Punishment', **Proceedings of the Aristotelian Society,** N.S. Vol. LX .

Hegel, W., 1991. **Elements of the Philosophy of Right,** ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press.

Flew, A., 1954, "The Justification of Punishment", Philosophy, Vol. 29.

Hill, Thomas E., Jr., 1992, **Dignity and Practical Reason in Kant's Moral Theory,** Ithaca, NY, Cornel University Press.

Kant, I. 2005. **Groundwork of the Metaphysics of Morals,** trans. Thomas K. Abbott, revised by Lara Denis, Broadview.

Korsgaard, Chritine.1986, "Kant's Formula of humanity", **Kant-Studien,** Volume 77 (1-4).

Luxemburg, Rosa, 1918, "Against Capital Punishment", collected from **Socialist Review,** Vol. 30, No.1, January-February 1969, translated by William L. McPherson ((from the French which was from the original in German) edited by Maurice Berger.

Murphy, Jeffrie G., 1973. Marxism and Retribution, 2 **Philosopy and Public Affirs.** 217

Paton, H. J. 1947, **The Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy,** London, Hutchison.

Salmond, Sir John.1913. Jurisprudence, Digital Library, Stevens and Haynes, 4th Edition, London, Digital version has got from Cornell University, USA.